অধ্যায় ১০

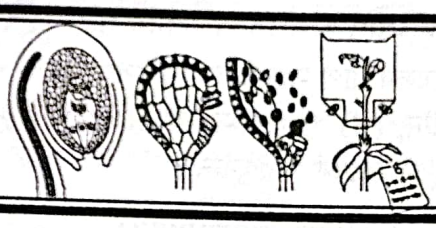

উদ্ভিদের প্রজনন
Plant Reproduction

প্রজনন হলো বংশের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নিজের অনুরূপ বংশধর উৎপন্ন করার শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতি। প্রজনন প্রত্যেক জীবের এক অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। প্রজননের মাধ্যমে প্রজাতির ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য সংরক্ষিত হয়।

প্রধান শব্দাবলি
- প্রজনন
- নিষেক
- পার্থেনোজেনেসিস
- সংকরায়ন

উদ্ভিদের প্রজনন প্রধানত দু'ধরনের–**ক. যৌন প্রজনন** ও **খ. অযৌন প্রজনন**।

বিপরীত যৌনধর্মী দুটি গ্যামেটের মিলনের ফলে বংশধর উৎপাদন পদ্ধতিকে **যৌন প্রজনন** (sexual reproduction) বলে। যৌন প্রজনন জীবের মূখ্য প্রজনন পদ্ধতি। যৌন প্রজননের মাধ্যমে উৎপন্ন বংশধর বংশবিস্তারের পাশাপাশি উক্ত প্রজাতির বিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কিছু কিছু উদ্ভিদে গ্যামেটের মিলন ছাড়াই দেহের অংশবিশেষ হতে সরাসরি বংশধর উৎপন্ন হতে দেখা যায়। এরূপ জনন পদ্ধতিকে **অযৌন প্রজনন** (asexual reproduction) বলে। যৌন প্রজননে বংশবিস্তারকারী অনেক উদ্ভিদে নিষেক ছাড়াই ডিম্বাণু থেকে **ভ্রূণ** (n) উৎপন্ন হয় এবং নতুন বংশধর উৎপন্ন করে। এ পদ্ধতিকে বলা হয় **পার্থেনোজেনেসিস** বা **অপুংজনি** (parthenogenesis)। এগুলো ছাড়াও বিভিন্ন উদ্ভিদে নানা প্রকার প্রজনন কৌশল দেখা যায়।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব	পাঠ পরিকল্পনা	
❖ বিভিন্ন প্রকার প্রজনন প্রক্রিয়া	পাঠ ১	যৌন প্রজনন
❖ বিভিন্ন প্রকার প্রজনন প্রক্রিয়ার মধ্যে তুলনা	পাঠ ২	অযৌন প্রজনন
❖ কৃত্রিম প্রজনন	পাঠ ৩	উদ্ভিদের কৃত্রিম অঙ্গজ জনন
❖ কৃত্রিম প্রজননের উপায় হিসেবে উদ্ভিদের সংকরায়ন	পাঠ ৪	উদ্ভিদ সংকরায়ন
❖ কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব		

আবৃতবীজী উদ্ভিদে যৌন প্রজনন (Sexual Reproduction in Angiosperm)

ফুল আবৃতবীজী উদ্ভিদের বিশেষায়িত যৌন জনন অঙ্গ এবং তা সম্পূর্ণই বিশেষভাবে রূপান্তরিত বিটপ। ফুলের পরাগধানীতে উৎপন্ন **পরাগরেণু** (পুংরেণু) এবং গর্ভাশয়ে উৎপন্ন **ডিম্বক** যৌন প্রজননে প্রধান ভূমিকা পালন করে। এ থেকে পরবর্তীতে পুংগ্যামেট এবং স্ত্রীগ্যামেট উৎপন্ন হয়। দু'প্রকার গ্যামেট মিলনের মাধ্যমে প্রথমে বীজ উৎপন্ন করে, যা পরবর্তীতে ভ্রূণ সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন উদ্ভিদের জন্ম দেয়।

যৌন প্রজননের বৈশিষ্ট্য

১. যৌন জননে দুটি পৃথক জনন কোষ বা গ্যামেটের প্রয়োজন হয়।

২. পুং ও স্ত্রী গ্যামেটের মিলনের ফলে **জাইগোট** উৎপন্ন হয়।

৩. উন্নত জীবে মিয়োসিসের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড (n) গ্যামেট উৎপন্ন হয়।

৪. মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড (n) জনু এবং নিষেকের ফলে ডিপ্লয়েড (2n) দশার সূচনা হয় অর্থাৎ যৌন প্রজননের ফলে জনুক্রম লক্ষ করা যায়।

৫. দুটি পৃথকধর্মী গ্যামেটের মিলন ও মিয়োসিসের সময় ক্রসিংওভার সম্পন্ন হয় বলে নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অপত্য জীব সৃষ্টি হয় যা জৈব বিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৬. নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে প্রতিকূল পরিবেশে যৌন প্রজনন ঘটে।

আবৃতবীজী উদ্ভিদের যৌন প্রজনন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

আবৃতবীজী উদ্ভিদের যৌন প্রজনন প্রক্রিয়ায় যেসব ধাপ সংঘটিত হয় সেগুলোকে কয়েকটি শিরোনামে ভাগ করে বর্ণনা করা যায়, যেমন– **(ক) পরাগরেণুর পরিস্ফুটন, (খ) পুংগ্যামেটোফাইটের পরিস্ফুটন, (গ) ডিম্বকের পরিস্ফুটন, (ঘ) স্ত্রী গ্যামেটোফাইটের পরিস্ফুটন, (ঙ) নিষেক, (চ) ভ্রূণের পরিস্ফুটন।**

ক. পরাগরেণুর পরিস্ফুটন (Development of Microsporangia)

পুষ্পের পুংজননাঙ্গকে বলা হয় **পুংকেশর** (stamen)। এর দুটি অংশ থাকে–লম্বা **পুংদণ্ড** (filament) এবং পিণ্ডাকৃতির **পরাগধানী** (anther)। পরাগধানীর ভিতর **পরাগরেণু** বা **মাইক্রোস্পোর** উৎপন্ন হয়। একটি পরিণত ও পরিপুষ্ট পরাগধানী সাধারণত দুটি স্ফীত অংশ নিয়ে গঠিত। অংশদুটি পরস্পর মাঝরেখায় **যোজক** বা **যোজনী** নামের বন্ধ্যা টিস্যু দিয়ে সংযুক্ত। প্রতিটি অংশ দুটি লম্বা প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত হয়। এগুলোকে **পরাগ প্রকোষ্ঠ** বা **পুংরেণুস্থলী** বলে। অতএব,

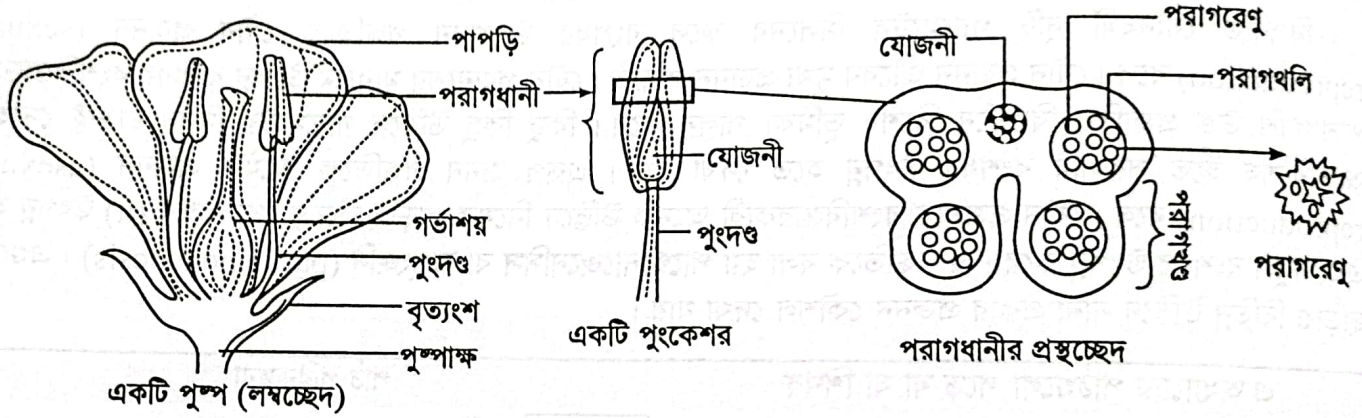

চিত্র ১০.১ : একটি পুষ্প (লম্বচ্ছেদ), একটি পুংকেশর, পরাগধানীর প্রস্থচ্ছেদ এবং একটি পরাগরেণু

একটি আদর্শ পরাগধানী চারটি পুংরেণুস্থলী নিয়ে গঠিত। পরিণত পরাগধানী অনেকটা চারকোণবিশিষ্ট। প্রতিকোণে ভিতরের দিকে কিছু কোষ আশপাশের কোষ হতে আকারে বড় হয়। এদের সাইটোপ্লাজম ঘন এবং বড় নিউক্লিয়াসযুক্ত। এসব কোষকে **আর্কিস্পোরিয়াল কোষ** বলে। আর্কিস্পেরিয়াল কোষ বিভাজিত হয়ে পরিধির দিকে দেয়াল কোষ এবং কেন্দ্রের দিকে প্রাথমিক জননকোষে পরিণত হয়।

একটি পরিণত পরাগধানীর প্রতিটি পুংরেণুস্থলীতে ৫–৭টি কোষ স্তর রয়েছে। এগুলো হচ্ছে সর্ববহিঃস্থ একস্তরবিশিষ্ট **এপিডার্মিস**, এরপর একস্তরবিশিষ্ট **এন্ডোথেসিয়াম**, ৩–৫ স্তরের **মধ্যল্যামেলা** এবং সবচেয়ে ভিতরের স্তরটির নাম **ট্যাপেটাম** (tapetum)। ট্যাপেটামের কোষগুলো বেশ বড় ও আড়াআড়ি সজ্জিত। এটি পুষ্টিস্তর রূপে কাজ করে।

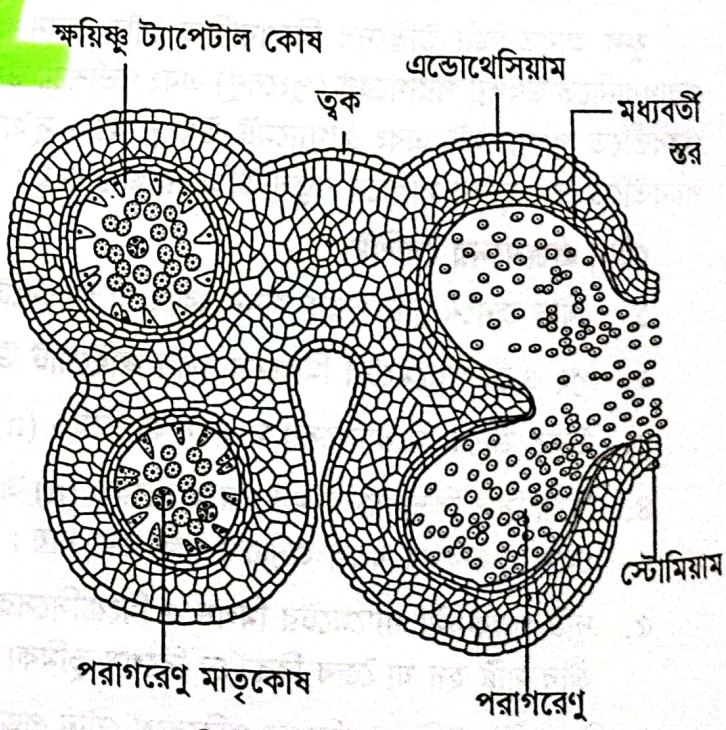

চিত্র ১০.২ : পরাগরেণুর উৎপত্তি

ট্যাপেটাম স্তরে ঘেরা বিশেষ কোষগুচ্ছে তৈরি **স্পোরোজেনাস** (sporogenous) টিস্যুর কোষগুলো অন্যান্য কোষ অপেক্ষা বড় ও প্রোটোপ্লাজমে পূর্ণ। কেন্দ্রীভূত এ বিশেষ টিস্যু এক সময় **পরাগ মাতৃকোষ** (pollen mother cell)-এ পরিণত হয়। প্রতিটি পরাগ মাতৃকোষ মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে চারটি হ্যাপ্লয়েড কোষের সৃষ্টি করে এবং পরাগরেণুগুলো পরস্পর যুক্ত থাকে। তখন এদেরকে **পরাগ চতুষ্টয়** (pollen tetrad) বলে। এ

সময় ট্যাপেটাম বিগলিত হয়ে পরাগরেণুর পুষ্টি যোগায়। পরিণত হলে **পরাগ চতুষ্টয়ের** বিমুক্তি ঘটে এবং প্রত্যেকটি একেকটি **পরাগরেণু**-তে পরিণত হয়।

পুষ্প যখন প্রস্ফুটিত হয় তখন পরাগধানীও পূর্ণতা লাভ করে এবং পরাগরেণু মুক্তির প্রস্তুতি গ্রহণ করে। পরাগধানী একসময় নির্দিষ্ট স্থানে বিদীর্ণ হলে রেণুগুলো পরাগায়নের উদ্দেশে ছড়িয়ে পড়ে। Orchidaceae, Asclepiadaceae এসব গোত্রের উদ্ভিদের পরাগরেণু পৃথক না হয়ে একসাথে থাকে। একসাথে থাকা পরাগারেণুগুলোর এ বিশেষ গঠনকে **পলিনিয়াম** (pollinium) বলে। পরাগরেণু সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে **মাইক্রোস্পোরোজেনেসিস** (microsporogenisis) বলা হয়।

পরাগরেণুর গঠন : পরাগরেণু গোলাকৃতির, ডিম্বাকৃতির, লম্বাকৃতি, ত্রিকোণাকৃতির প্রভৃতি আকৃতির হয় এবং এদের ব্যাস ০.০২৫–০.২৫ মিমি। প্রতিটি পরাগরেণু দ্বিত্বকীয় আবরণ দিয়ে পরিবেষ্টিত। ভিতরের পাতলা, মসৃণ ও সেলুলোজ নির্মিত ত্বককে **ইন্টাইন** (intine) বলে। বাইরের পুরু, শক্ত, অমসৃণ ও কিউটিনযুক্ত ত্বককে **এক্সাইন** (exine) বলা হয়। এক্সাইন-এর প্রধান রাসায়নিক উপাদান **স্পোরোপোলেনিন**। এক্সাইনের স্থানে স্থানে অত্যন্ত পাতলা থাকে, পাতলা রন্ধ্রের মতো অংশকে **রেণুরন্ধ্র** বা **জার্মপোর** (germ pore) বলে। একটি পরাগরেণুতে একাধিক জার্মপোর (২০টি) থাকে। পরাগরেণুর সাইটোপ্লাজম ঘন থাকে। প্রথম পর্যায়ে নিউক্লিয়াসটি মাঝখানে থাকে। পরিণত অবস্থায় কোষগহ্বর সৃষ্টির ফলে নিউক্লিয়াসটি পরিধির দিকে সরে আসে।

খ. পুংগ্যামেটোফাইটের পরিস্ফুটন (Development of male Gametophyte)

পুংগ্যামেটোফাইটের পরিস্ফুটন প্রক্রিয়াটি মূলত পরাগরেণু পরাগধানীর অভ্যন্তরে থাকাকালেই শুরু হয়। **পরাগরেণু** (n) উদ্ভিদের গ্যামটোফাইটের **প্রথম কোষ**। পুংগ্যামেটোফাইটের পরিস্ফুটনের ধাপগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. পরাগধানীর অভ্যন্তরে ডিপ্লয়েড (2n) **রেণু মাতৃকোষ** থেকে মিয়োসিসের মাধ্যমে ৪টি হ্যাপ্লয়েড (n) পরাগরেণু তৈরি হয়। পরাগরেণু থেকে পরবর্তীতে পুংগ্যামেট উৎপন্ন হয়।

চিত্র ১০.৩ : পুংগ্যামেট সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ

২. পরাগরেণুর নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে দুটি অসম নিউক্লিয়াস তৈরি করে। গোলাকার অপেক্ষাকৃত বড় নিউক্লিয়াসটিকে **নালিকা নিউক্লিয়াস** এবং ক্ষুদ্র সামান্য বাঁকা নিউক্লিয়াসটিকে **জনন নিউক্লিয়াস** বলে।

৩. পরাগরেণুর অভ্যন্তরস্থ সাইটোপ্লাজমের চাপে এক্সাইন ফেটে যায় এবং ইন্টাইন নালিকাকারে বৃদ্ধি পেয়ে রেণুরন্ধ্র দিয়ে বাড়তে থাকে। এ নালিকাকে **পরাগনালিকা** বলে।

৪. পরবর্তীতে নালিকা নিউক্লিয়াস ও জনন নিউক্লিয়াস পরাগনালিকাতে প্রবেশ করে। নালিকা নিউক্লিয়াসটি অগ্রভাগে থাকে।

৫. জনন নিউক্লিয়াসটি এরপর বিভাজিত হয়ে দুটি পুংজননকোষ বা **পুংগ্যামেট** সৃষ্টি করে।

৬. পরাগরেণু, পরাগনালিকা, পুংগ্যামেট, নালিকা নিউক্লিয়াস এগুলোর সমন্বয়ে গঠিত হয় **পুংগ্যামেটোফাইট**।

গ. ডিম্বকের পরিস্ফুটন (Development of Ovule)

সপুষ্পক উদ্ভিদের স্ত্রী জননাঙ্গ বলতে স্ত্রীস্তবকের **গর্ভকেশর** বা **গর্ভপত্রকে** (carpel) বুঝায়। প্রতিটি গর্ভকেশর তিন অংশে বিভক্ত–**গর্ভমুন্ড, গর্ভদন্ড** এবং **ডিম্বাশয়**। ডিম্বাশয়ের অভ্যন্তরে অমরার সাথে যুক্ত যে স্ফীত অংশ দেখা যায় তার নাম **ডিম্বক** (ovule)। ক্ষেত্রবিশেষে একটি গর্ভাশয়ে এক বা একাধিক ডিম্বক থাকতে পারে। ডিম্বকের ভিতরে **ডিম্বাণু** (egg) উৎপন্ন হয়।

ডিম্বকের গঠন

একটি ডিম্বক নিচে বর্ণিত অংশ নিয়ে গঠিত :

১. ডিম্বকনাড়ী (Funicle or Funiculus) : বৃন্তের মতো দেখতে যে সরু ও সংক্ষিপ্ত অংশ দিয়ে এক বা একাধিক ডিম্বক অমরার সাথে যুক্ত থাকে তাকে **ডিম্বকনাড়ী** বলে। কোন কোন প্রজাতির ডিম্বকে ডিম্বকনাড়ী ডিম্বকত্বকের সাথে আংশিকভাবে যুক্ত থেকে শিরার মত গঠন তৈরী করে, একে **র‍্যাফি** (raphe) বলে।

২. ডিম্বকনাভী (Hilum) : ডিম্বকের যে স্থানে ডিম্বকনাড়ী সংযুক্ত থাকে তাকে **ডিম্বকনাভী** বলে।

৩. ডিম্বকমূল (Chalaza) : এটি ডিম্বকের গোড়ার দিকের বিশেষ অংশ যা থেকে ডিম্বকত্বক উৎপন্ন হয়।

৪. ডিম্বকত্বক (Integument) : নিউসেলাসের বাইরের দ্বিস্তরযুক্ত আবরণকে **ডিম্বকত্বক** বলে।

৫. ডিম্বকরন্ধ্র (Micropyle): ডিম্বকত্বক ডিম্বককে সম্পূর্ণ আবৃত না করায় অগ্রপ্রান্তে **ডিম্বকরন্ধ্র** নামের একটি ছিদ্রের সৃষ্টি হয়।

৬. ভ্রূণপোষক বা নিউসেলাস (Nucelleus) **:** ডিম্বকের মূল দেহকে ভ্রূণপোষক বা **নিউসেলাস** বলে। এটি প্যারেনকাইমা টিস্যু দিয়ে গঠিত ও ডিম্বকত্বক দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকে। এর মধ্যেই থাকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ **ভ্রূণথলি**।

৭. ভ্রূণথলি (Embryo-sac) : এটি নিউসেলাসের ভিতর ডিম্বকরন্ধ্রের দিকে অবস্থিত ডিম্বাকৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ। ভ্রূণথলি নিচে বর্ণিত তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত।

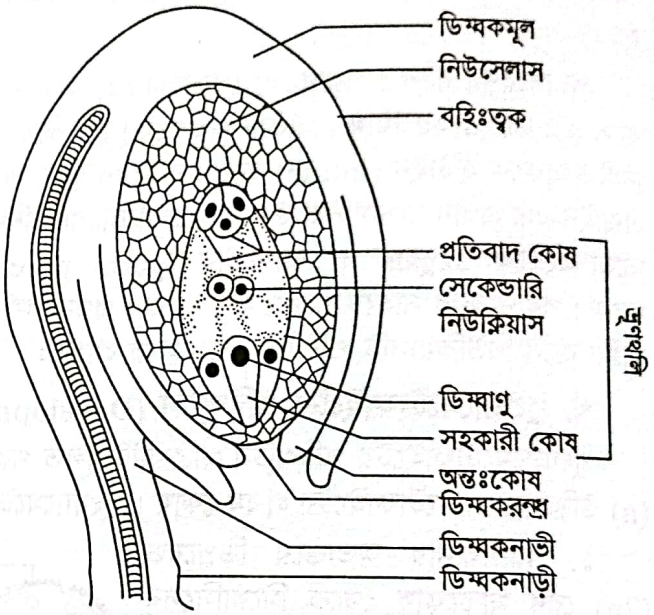

চিত্র ১০.৪ : একটি ডিম্বকের লম্বচ্ছেদ

i. **গর্ভযন্ত্র** (Egg-apparatus) : ডিম্বকরন্ধ্রের সন্নিকটে তিনটি কোষ দিয়ে গঠিত ভ্রূণথলির অংশকে **গর্ভযন্ত্র** বলে। গর্ভযন্ত্রের তিনটি কোষের মধ্যে ভিতরের সবচেয়ে বড় কোষটিকে **ডিম্বাণু** (egg) এবং বাইরের দিকের ছোট কোষদুটিকে **সহকারী কোষ** (synergids) বলে।)

ii. **প্রতিপাদ কোষ** (Antipodal cell) : এরা ডিম্বকমূলের দিকে অবস্থিত ভ্রূণথলির তিনটি বিশেষ কোষ।

iii. **সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস** (Secondary nucleus) : দুমেরু থেকে আগত এবং ভ্রূণথলির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত দুটি নিউক্লিয়াসকে **মেরু নিউক্লিয়াস** (polar nucleus) বলে। নিউক্লিয়াস দুটি মিলিত হয়ে যে একটি ডিপ্লয়েড (2n) নিউক্লিয়াস গঠন করে তার নাম **সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস**।

বিভিন্ন প্রকার ডিম্বক : ডিম্বকরন্ধ্র, ডিম্বননাড়ী, ডিম্বকমূল ইত্যাদি অংশের পারস্পরিক অবস্থান অনুযায়ী ডিম্বক নিম্নলিখিত প্রকার হয়ে থাকে।

১. ঊর্ধ্বমুখী (Orthotropous বা Atropous) : ঊর্ধ্বমুখী অর্থাৎ ডিম্বকের মুখ উপরে থাকে। এই প্রকার ডিম্বকে ডিম্বকনাড়ী, ডিম্বকমূল ও ডিম্বকরন্ধ্র একই সরল রেখায় খাড়াভাবে অবস্থিত থাকে। ডিম্বকরন্ধ্র শীর্ষে এবং ডিম্বকমূল গোড়ায় অবস্থান করে। উদাহরণ : বিষকাটালী (পানি মরিচ), গোলমরিচ, পান ইত্যাদি।

২. অধোমুখী বা নিম্নমুখী (Anatropous) : অধোমুখী অর্থাৎ ডিম্বকের মুখ নিচে থাকে। এই প্রকার ডিম্বকে ডিম্বকরন্ধ্র নিচের দিকে ডিম্বকনাড়ীর

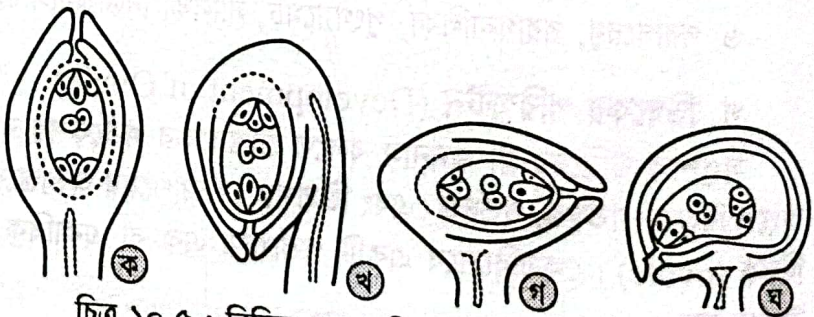

চিত্র ১০.৫ : বিভিন্ন প্রকার ডিম্বকের গঠন। (ক) ঊর্ধ্বমুখী; (খ) অধোমুখী; (গ) পার্শ্বমুখী; (ঘ) বক্রমুখী।

কাছাকাছি থাকে, আর ডিম্বকমূল উপরে থাকে। উদাহরণ : শিম, রেড়ি, মটর ও ছোলা ইত্যাদি। ঊর্ধ্বমুখী ও অধোমুখী একটি অপরটির উল্টো।

৩. **পার্শ্বমুখী** (Amphitropous) : পার্শ্বমুখী অর্থাৎ ডিম্বকের মুখ উপরে বা নিচে নয়, এক পাশে থাকে। এই প্রকার ডিম্বকের ডিম্বকরন্ধ্র ও ডিম্বকমূল বিপরীতমুখী অবস্থানে দুই পাশে থাকে এবং ডিম্বকনাড়ীর সাথে সমকোণে অবস্থান করে। উদাহরণ-ক্ষুদিপানা, পপি (আফিম) ইত্যাদি।

৪. **বক্রমুখী** (Campylotropous) : বক্রমুখী অর্থাৎ ডিম্বকের মুখ পার্শ্বমুখীর চেয়ে কিছুটা বেঁকে নিচের দিকে মুখ করানো অবস্থায় থাকে। এই প্রকার ডিম্বকে ডিম্বকমূল ডিম্বকনাড়ীর সাথে সমকোণে অবস্থিত কিন্তু ডিম্বকরন্ধ্র অঞ্চলটি একটু বাঁকা হয়ে ডিম্বকনাড়ীর কাছাকাছি চলে আসে। উদাহরণ-সরিষা, কালকাসুন্দা।

স্ত্রীরেণুর পরিস্ফুটন : একটি পরিপক্ক ডিম্বক একগুচ্ছ কোষবিশিষ্ট নিউসেলাস টিস্যুতে পরিপূর্ণ থাকে। ডিম্বকরন্ধ্রের কাছাকাছি নিউসেলাসের মধ্যে একটি কোষ সক্রিয় হয়ে বড় আকার ধারণ করে। এতে সাইটোপ্লাজমের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং নিউক্লিয়াসের আকার বড় হয়। কোষটিকে তখন **আর্কিস্পোরিয়াল কোষ** বলে। কোনো কোনো উদ্ভিদে এ কোষ সরাসরি **স্ত্রীরেণু মাতৃকোষ** (megaspore mother cell)-এ পরিণত হয়, অন্যান্য উদ্ভিদে একবার বিভক্ত হয়ে বাইরের দিকে পেরিয়েটাল এবং ভিতরের দিকে জননকোষে পরিণত হয় যা পরবর্তীতে **স্ত্রীরেণু মাতৃকোষ** হিসেবে কার্যকর হয়। স্ত্রীরেণু মাতৃকোষ (2n) মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে চারটি অপত্য হ্যাপ্লয়েড (n) কোষে পরিণত হয়। এগুলো নলাকৃতিতে সজ্জিত হয়। প্রত্যেক কোষকে তখন **স্ত্রীরেণু** (megaspore) বলে। এ চারটি রেণুর মধ্যে ডিম্বকরন্ধ্রের সংলগ্ন তিনটি রেণু (কতিপয় প্রজাতিতে আরও কম) নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, বাকি রেণুকোষটি দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং প্রোটোপ্লাজমীয় উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ স্ত্রীরেণুতে পরিস্ফুটিত হয়।

ঘ. স্ত্রীগ্যামেটোফাইটের পরিস্ফুটন (Development of Female Gametophyte)

স্ত্রীরেণু (megaspore) হলো স্ত্রীগ্যামেটোফাইট-এর প্রথম কোষ। কার্যকরী স্ত্রীরেণুটি বিভাজিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে স্ত্রীগ্যামেটোফাইট গঠন করে। স্ত্রীগ্যামেটোফাইট **ভ্রূণথলি** নামেও পরিচিত। ভ্রূণথলি প্রধানত তিন প্রকার, যথা–

(i) **মনোস্পোরিক** (monosporic)—যখন একটি স্ত্রীরেণু ভ্রূণথলি গঠনে অংশগ্রহণ করে; এটি পানি মরিচে ঘটে।

(ii) **বাইস্পোরিক** (bisporic)—যখন দুটি স্ত্রীরেণু ভ্রূণথলি গঠনে অংশগ্রহণ করে; যেমন– পেঁয়াজে ঘটে এবং

(iii) **টেট্রাস্পোরিক** (tetrasporic)—যখন চারটি স্ত্রীরেণুই ভ্রূণথলি গঠনে অংশগ্রহণ করে। যেমন–পেপারোমিয়াতে ঘটে।

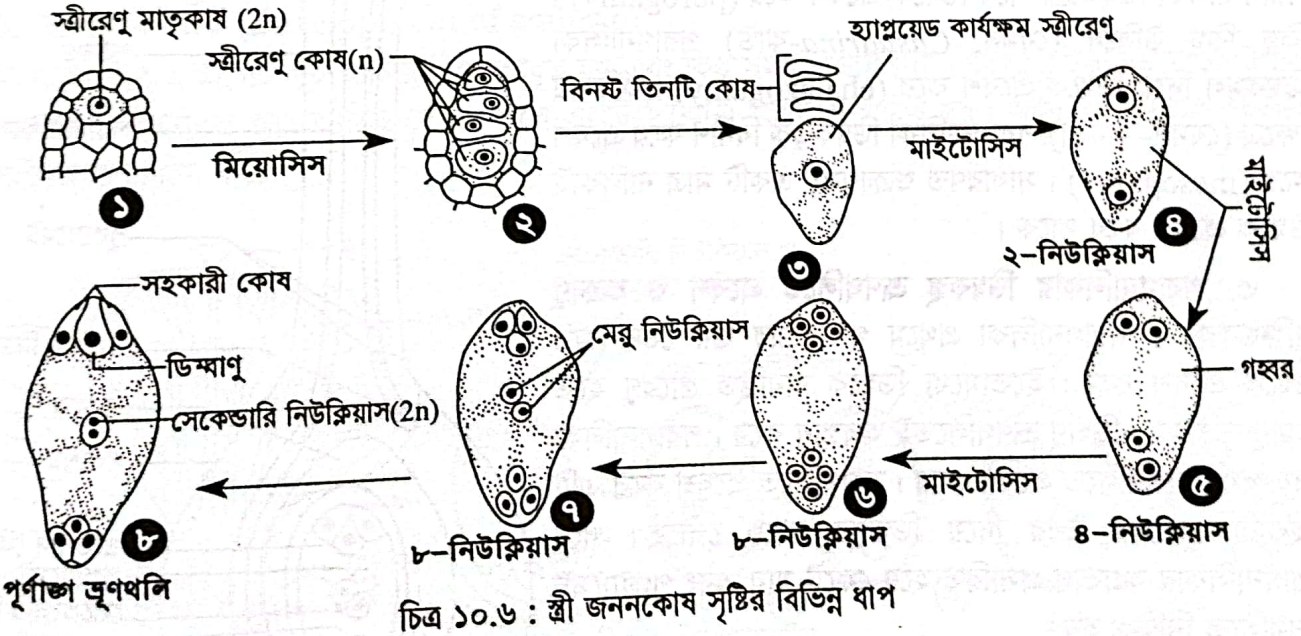

চিত্র ১০.৬ : স্ত্রী জননকোষ সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ

শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ ক্ষেত্রে মনোস্পোরিক প্রক্রিয়ায় ভ্রূণথলি গঠিত হয়, তাই এখানে ভ্রূণথলি গঠনের মনোস্পোরিক প্রক্রিয়াই বর্ণনা করা হলো। এটি Polygonum ধরণ হিসেবেও পরিচিত। সর্বপ্রথম **স্ট্রাসবার্গার** ১৮৭৯ সালে *Polygonum divaricatum* নামক উদ্ভিদে মনোস্পোরিক প্রক্রিয়ায় ভ্রূণথলি গঠনের বিশদ বর্ণনা দেন।

স্ত্রীগ্যামেটোফাইট সৃষ্টি : ডিম্বকের অভ্যন্তরে ভ্রূণপোষক টিস্যুর (নিউসেলাস) মাঝে একটি ডিপ্লয়েড স্ত্রীরেণু মাতৃকোষ (2n) মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে চারটি হ্যাপ্লয়েড স্ত্রীরেণু গঠন করে। এই ৪টি হ্যাপ্লয়েড (n) স্ত্রীরেণুর উপরের তিনটি নষ্ট হয়ে যায় এবং নিচের একটি মাত্র স্ত্রীরেণু কার্যক্ষম থাকে। কার্যক্ষম স্ত্রীরেণুর নিউক্লিয়াসটি প্রথমে বিভাজিত হয়ে দুটি মেরু নিউক্লিয়াস তৈরি করে। দু'মেরুতে অবস্থিত নিউক্লিয়াস দুটি দু'বার বিভাজিত হয়ে দুইপ্রান্তে চারটি করে মোট আটটি নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় নিউক্লিয়াসগুলো ভ্রূণথলির অভ্যন্তরে বিন্যস্ত থাকে। দু'মেরু হতে দুটি নিউক্লিয়াস ভ্রূণথলির মাঝখানে এসে মিলিত হয় এবং ডিপ্লয়েড (n+n=2n) **সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস** (secondary nucleus) গঠন করে। দু'মেরুতে অবস্থিত নিউক্লিয়াসগুলো সাইটোপ্লাজম দিয়ে আবদ্ধ হয়। ডিম্বকরন্ধ্রের দিকে অবস্থিত কোষ তিনটিকে একত্রে **গর্ভযন্ত্র** এবং ডিম্বকমূল অঞ্চলের কোষ তিনটিকে **প্রতিপাদ কোষ** বলে। গর্ভযন্ত্রের মাঝের কোষটি অপেক্ষাকৃত বড় ও গোলাকার হয়। একে **ডিম্বাণু** বা স্ত্রীগ্যামেট বলে এবং এর দু'পাশের কোষদুটিকে **সহকারী কোষ** বলা হয়। ভ্রূণথলি এবং এর মাঝে অবস্থিত ডিম্বাণু, সহকারী কোষ, প্রতিপাদ কোষ ও সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসকে সম্মিলিতভাবে বলা হয় **স্ত্রীগ্যামেটোফাইট**।

৬. নিষেক প্রক্রিয়া (Fertilization)

আবৃতবীজী উদ্ভিদের **যৌন প্রজনন** পদ্ধতি **উগ্যামাস** প্রকৃতির। অপেক্ষাকৃত বড় ও নিশ্চল স্ত্রীগ্যামেট বা ডিম্বাণু-র সাথে ছোট ও সচল পুংগ্যামেট বা শুক্রাণু-র যৌন মিলনে **নিষেক প্রক্রিয়া** সম্পন্ন হয়। এ সময় গর্ভাশয় ও ডিম্বক নিঃসৃত পদার্থে Ca^{++} আয়ন উপস্থিত থাকে।

বর্ণনার সুবিধার্থে নিষেক প্রক্রিয়াটিকে নিম্নলিখিত ধাপের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়।

১. পরাগরেণুর অঙ্কুরোদগম : পরাগরেণু উপযুক্ত গর্ভমুন্ডে পতিত হলে সেখান থেকে তরল রস শোষণ করে আকারে বড় হয় এবং অঙ্কুরিত হয়ে পরাগরেণুর পাতলা অভ্যন্তর প্রাচীর প্রসারিত হয়ে রন্ধ্রপথে পরাগনালিকা রূপে বেরিয়ে আসে।

২. পরাগনালিকার গর্ভাশয়মুখী যাত্রা ও শুক্রাণু সৃষ্টি : পরাগনালিকাটি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে গর্ভমুন্ড থেকে গর্ভদন্ডের ভিতর দিয়ে গর্ভাশয় পর্যন্ত পৌঁছায় এবং গর্ভাশয়ের স্তর ভেদ করে ডিম্বক পর্যন্ত চলে আসে। ইতোমধ্যে পরাগনালিকার ভিতরে অবস্থিত জনন নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে দুটি পুংগ্যামেট বা শুক্রাণু সৃষ্টি করে। অধিকাংশ উদ্ভিদে পরাগনালিকা ডিম্বকরন্ধ্র পথে ডিম্বকে প্রবেশ করে (porogamy)। কিছু কিছু উদ্ভিদে (যেমন, *Casuarina*-ঝাউ) পরাগনালিকা ডিম্বকমূল দিয়ে ডিম্বকে প্রবেশ করে (chalazogamy)। কতিপয় ক্ষেত্রে (যেমন- কুমড়া) পরাগনালিকা ডিম্বকত্বক বিদীর্ণ করে প্রবেশ করে (mesogamy)। সাধারণত শুক্রাণুসহ একটি মাত্র নালিকাই ডিম্বকে প্রবেশ করে থাকে।

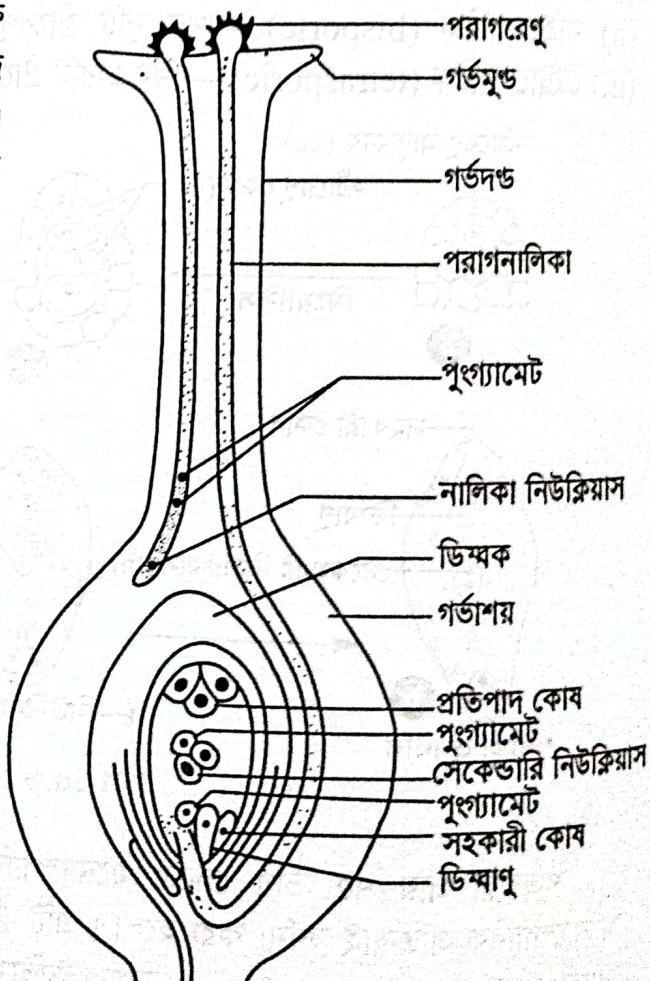

চিত্র ১০.৭ : আবৃতবীজী উদ্ভিদের নিষেকক্রিয়া

৩. পরাগনালিকার ডিম্বকস্থ ভ্রূণথলিতে প্রবেশ ও শুক্রাণু নিক্ষিপ্তকরণ : পরাগনালিকা প্রথমে গর্ভাশয়ের স্তর ভেদ করে ডিম্বকে প্রবেশ করে। ইতোমধ্যে ডিম্বকে অবস্থিত স্ত্রীরেণু হতে ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। ডিম্বাণু ভ্রূণথলিতেই অবস্থান করে। পরাগনালিকা শেষ পর্যন্ত ভ্রূণথলিতে প্রবেশ করে। ভ্রূণথলিতে প্রবেশ করে এটি সহকারী কোষের উপর দিয়ে ডিম্বাণুর কাছে পৌঁছে। পরে পরাগনালিকার অগ্রভাগ প্রসারিত হয়ে ফেটে যায় এবং পুংগ্যামেট ভ্রূণথলিতে নিক্ষিপ্ত হয়।

৪. ভ্রূণথলিতে ডিম্বাণুর সাথে শুক্রাণুর মিলন : পরাগনালিকা থেকে ভ্রূণথলিতে নিক্ষিপ্ত দুটি পুংগ্যামেটের মধ্যে একটি ডিম্বাণুর সাথে মিলিত ও একীভূত হয়ে যায় অর্থাৎ নিষেকক্রিয়া সম্পন্ন

করে। এ ধরনের মিলনকে **সিনগ্যামি** (syngamy) বলে। অপর পুংগ্যামেটটি সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত ও একীভূত হয়। এ ধরনের মিলনকে **ত্রিমিলন** (triple fusion) বলে।

দ্বি-নিষেকক্রিয়া (Double fertilization)

একই সময়ে ডিম্বাণুর সাথে একটি পুংগ্যামেটের মিলন ও সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে অপর পুংগ্যামেটের মিলন প্রক্রিয়াকে **দ্বি-নিষেকক্রিয়া** বা **দ্বি-গর্ভাধান** প্রক্রিয়া বলে। ১৮৯৮ সালে **নাওয়াসিন** (Nawaschin) আবৃতবীজী উদ্ভিদে দ্বিনিষেক আবিষ্কার করেন। Williams Friendman ১৯৯০ সালে *Ephedra nevadensis* নামক নগ্নবীজী উদ্ভিদে দ্বিনিষেক আবিষ্কার করেন। এ প্রক্রিয়ায় একটি পুংগ্যামেট ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয় এবং অপর পুংগ্যামেট সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়; ফলে ডিম্বাণু **জাইগোট**-এ পরিণত হয় এবং ডিপ্লয়েড (2n) অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অপরদিকে সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস **ট্রিপ্লয়েড** (3n) অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এটি কয়েকবার বিভাজন ও বিকাশের মাধ্যমে **সস্যটিস্যু** গঠন করে। এ সস্য-ভ্রূণের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সস্যটিস্যুতে প্রচুর পরিমাণ স্টার্চ, লিপিড ও প্রোটিন জমা থাকে।

সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে পুংগ্যামেটের মিলনকে **ত্রিমিলন** বলা হয়, কারণ এতে দুটি মেরু নিউক্লিয়াস ও একটি পুংনিউক্লিয়াসসহ তিনটি নিউক্লিয়াসের মিলন ঘটে। নিষেকের পর গর্ভাশয়ে বিভিন্ন পরিবর্তনের শেষ পর্যায়ে ডিম্বক **বীজ** (seed)-এ এবং গর্ভাশয় **ফল** (fruit)-এ পরিণত হয়।

নিষেক ও দ্বি-নিষেকের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	নিষেক	দ্বি-নিষেক
১. সংজ্ঞা	পুংগ্যামেট ও স্ত্রীগ্যামেটের মিলন প্রক্রিয়া।	একই সময়ে ডিম্বাণুর সাথে একটি পুংগ্যামেটের মিলন ও সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে অপর পুংগ্যামেটের মিলনের প্রক্রিয়া।
২. কোন উদ্ভিদে ঘটে	সপুষ্পক উদ্ভিদে।	শুধু আবৃতবীজী উদ্ভিদে।
৩. গ্যামেটের প্রয়োজনীয়তা	১টি পুংগ্যামেটের প্রয়োজন হয়।	২টি পুংগ্যামেটের প্রয়োজন হয়।
৪. ফলাফল	এর ফলে শুধু ভ্রূণের উৎপত্তি হয়।	ভ্রূণ ও সস্যটিস্যু উৎপন্ন করে।

চ. ভ্রূণের উৎপত্তি (Development of embryo)

নিষেকের পর জাইগোট পুরু প্রাচীর দিয়ে আবৃত হয় এবং কিছু সময় বিশ্রাম নেয়। জাইগোটের বিশ্রাম কেটে গেলে প্রথম বিভাজন সাধারণত আড়াআড়িভাবে হয় ফলে একটি দ্বিকোষী **আদিভ্রূণ** গঠিত হয়। আদিভ্রূণ সবতলে বিভাজিত হয়ে **পরিণত ভ্রূণ** গঠন করে।

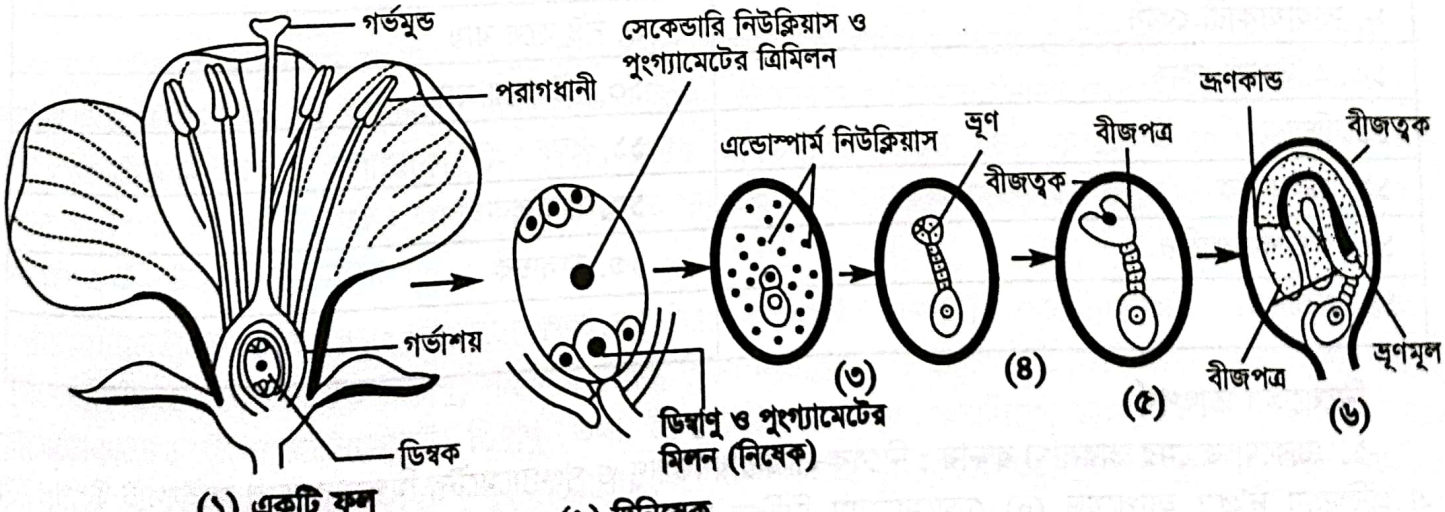

চিত্র ১০.৮ : বীজ সৃষ্টি প্রক্রিয়া

সস্যের উৎপত্তি (Development of endosperm) : ভ্রূণ উৎপন্ন হওয়ার সাথে সাথে সস্য নিউক্লিয়াসটি দ্রুত মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে অনেকগুলো নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। নিউক্লিয়াসগুলো সাইটোপ্লাজমের সমন্বয়ে কোষে পরিণত হয়ে বিশেষ এক ধরনের টিস্যুর সৃষ্টি করে। এ টিস্যুকে **সস্য** বা **এন্ডোস্পার্ম** (endosperm) বলে। পরিস্ফুটনরত ভ্রূণের দ্বারা বীজের সস্য সম্পূর্ণরূপে শোষিত হওয়ায় বীজটি যদি সস্যবিহীন হয়, তখন সেই প্রকার বীজকে **অসস্যল বীজ** (non-endospermic seed) বলে-যেমন মটর, ছোলা, আম ইত্যাদি।

অপর পক্ষে বীজে যদি সস্যের কিছু অংশ বর্তমান থাকে তবে সেই প্রকার বীজকে **সস্যল বীজ** (endospermic seed) বলা হয়। যেমন–ধান, গম, রেড়ি, ভুট্টা, তুলা ইত্যাদি।

ফলের উৎপত্তি (Development of fruit): নিষেকের পর ফুলের স্তবকগুলোর মধ্যে গর্ভাশয় ছাড়া অন্যসব অংশ সাধারণত শুকিয়ে ঝরে পড়ে। নিষেক গর্ভাশয়কে বর্ধিত হতে উদ্দীপিত করে। ক্রমবৃদ্ধির ও বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে গর্ভাশয় শেষ পর্যন্ত ফলে পরিণত হয়। একটি পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণে বীজপত্র ও ভ্রূণের ভ্রূণাক্ষ থাকে। ভ্রূণাক্ষের উপরের অংশ **ভ্রূণমুকুল** এবং নিম্নাংশ হলো **ভ্রূণমূল**।

বীজের উৎপত্তি (Development of seed) : নিষেকের উদ্দীপনায় ভ্রূণ ও সস্যের বৃদ্ধির সাথে সাথে গর্ভাশয়ের অন্যান্য অংশও দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। ডিম্বকত্বক পরিবর্তিত হয়ে বীজত্বকে পরিণত হয়। একই সাথে খাদ্যের জলীয় অংশ ক্রমান্বয়ে কমে যাওয়ায় নরম ডিম্বক শুষ্ক হয়ে কঠিন বীজে পরিণত হয়। এরূপ পরিবর্তনকালে ডিম্বকনাড়ীটি বীজের তৃতীয় স্তর সৃষ্টি করে। একে **এরিল** (aril) বা **বীজ উপাঙ্গ** বলে। লিচু, কাঠলিচু, জায়ফল, শাপলা বীজে এরিল সৃষ্টি হয়। লিচু ও কাঠলিচুর এরিল হলো ভোজ্য অংশ।

নিষেকের পর গর্ভাশয় ও ডিম্বকের পরিবর্তন

নিষেকের আগে	নিষেকের পরে
১. ডিম্বরন্ধ্র	১. বীজরন্ধ্র
২. ডিম্বকনাভী	২. বীজনাভী
৩. ডিম্বকনাড়ী	৩. বীজবৃন্ত
৪. এক্সাইন	৪. টেস্টা
৫. ইন্টাইন	৫. টেগমেন
৬. ভ্রূণপোষক (নিউসেলাস)	৬. নষ্ট হয়ে যায় অথবা পেরিস্পার্মে পরিণত হয়
৭. ডিম্বাণু	৭. ভ্রূণ
৮. সস্য নিউক্লিয়াস	৮. সস্য বা এণ্ডোস্পার্ম
৯. সাহায্যকারী কোষ	৯. নষ্ট হয়ে যায়
১০. প্রতিপাদ কোষ	১০. নষ্ট হয়ে যায়
১১. ডিম্বক	১১. বীজ
১২. ডিম্বকত্বক	১২. বীজত্বক
১৩. গর্ভাশয় প্রাচীর	১৩. ফলত্বক
১৪. গর্ভাশয়	১৪. ফল

নিষেকের তাৎপর্য

১. ক্রোমোজোমের ভারসাম্য রক্ষায় : নিষেক প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু ও পুংগ্যামেটের মিলনের ফলে জাইগোট উৎপন্ন হয়। এ প্রক্রিয়ায় দু'প্রস্থ হ্যাপ্লয়েড (n) ক্রোমোজোম মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড (2n) অবস্থা ফিরে আসে। ফলে প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যার স্থিরতা রক্ষিত হয়।

২. **ফল ও বীজ সৃষ্টি :** নিষেকের উদ্দীপনায় ডিম্বাশয় ও ডিম্বক যথাক্রমে ফল ও বীজে পরিণত হয়।

৩. **নতুন প্রজাতি সৃষ্টি :** নিষেকের ফলে বংশধরদের মধ্যে নতুন বৈশিষ্ট্যের সঞ্চার হয়। ফলে নতুন প্রজাতি সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে।

৪. **বিবর্তনে :** নিষেকের পরে সৃষ্ট প্রকরণ বিবর্তনের পথ নির্দেশ করে।

৫. **অধিক ফলনশীল ও সহনশীল ফসল সৃষ্টি :** নিষেকের ফলে অধিক ফলনশীল, সবল ও সহনশীল ফসল উৎপন্ন হয়।

৬. **উদ্ভিদের বংশ রক্ষা :** নিষেক ক্রিয়ার ফলেই বীজ ও ফলের সৃষ্টি হয়। বীজ উদ্ভিদের বংশ রক্ষা করে থাকে। বীজের সৃষ্টি না হলে বেশির ভাগ সপুষ্পক উদ্ভিদই হয়ত বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত।

৭. **খাদ্যের যোগান :** উদ্ভিদের ফল ও বীজের উপরই প্রাণী সম্প্রদায় বিশেষ করে মানুষ নির্ভরশীল। কাজেই নিষেকক্রিয়া যত না গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের জন্য তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ মানব জাতির জন্য। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, বেল, পেঁপে, ধান, গম, যব, ভুট্টা, প্রভৃতি যা খেয়ে থাকি তা সবই নিষেকক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়। ডাল, তেল, সব্জি,ফল, তন্তু, পানীয়, মসলা, ভেষজ জাতীয় সকল উদ্ভিদই আমরা নিষেকক্রিয়ার মাধ্যমে পেয়ে থাকি।

৮. **জেনেটিক ডাইভারসিটি সৃষ্টি :** যৌন প্রজননে নিষেকক্রিয়ায় জিনের মিশ্রণ (রিকম্বিনেশন) ঘটে, এর ফলে জেনেটিক ডাইভারসিটি সৃষ্টি হয়।

যৌন প্রজননের সুফল

i. যৌন প্রজননের ফলে রিকম্বিনেশনের মাধ্যমে **জেনেটিক ডাইভার্সিটি** তৈরি হয়।
ii. জেনেটিক ডাইভার্সিটির কারণে উদ্ভিদের নতুন ও পরিবর্তিত পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে সুবিধা হয়।
iii. নতুন **প্রকরণ** সৃষ্টি হতে পারে।
iv. আমাদের খাদ্য দানা, তৈলবীজ ইত্যাদি এর মাধ্যমে পেয়ে থাকি।

অসুবিধাসমূহ

i. যৌন প্রজননের জন্য দুটি বিপরীত লিঙ্গের প্রয়োজন হয়, যা প্রকৃতিতে সবসময় পাওয়া যায় না।
ii. পুংগ্যামেট ও স্ত্রীগ্যামেটের মিলনের জন্য যথেষ্ট সুযোগ থাকা দরকার।
iii. নিষেক ঘটাও সহজ হয় না।
iv. যৌন প্রজননের জন্য পর্যাপ্ত সময়ের প্রয়োজন হয়।
v. যৌন প্রজননের মিলন পদ্ধতি জটিল হওয়ায় গ্যামেটের অপচয় ঘটে।

আবৃতবীজী উদ্ভিদের জীবন চক্রে জনুক্রম (Alternation of generations in life cycle of Angiosperm)

কোনো জীবের জীবনচক্র সম্পন্ন করার সময় গ্যামেটোফাইটিক পর্যায়ের সাথে স্পোরোফাইটিক পর্যায়ের যে পালাক্রম ঘটে তাকে বলা হয় জনুক্রম। আবৃতবীজী উদ্ভিদের জীবনচক্র পর্যবেক্ষণ করলে সেখানে সুস্পষ্ট দুটি পর্যায় অর্থাৎ **গ্যামেটোফাইটিক** ও **স্পোরোফাইটিক** পর্যায় দুটির আবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং আবৃতবীজী উদ্ভিদের জীবনচক্রে সুস্পষ্ট জনুক্রম রয়েছে। আবৃতবীজী উদ্ভিদের জনুক্রমকে বলা হয় **অসমপ্রকৃতির জনুক্রম**। নিচে সংক্ষেপে এদের জনুক্রমটি উল্লেখ করা হলো–

গ্যামেটোফাইটিক পর্যায় (n) : গ্যামেটোফাইটিক পর্যায়ে পুংগ্যামেট (শুক্রাণু, n) এবং স্ত্রীগ্যামেট (ডিম্বাণু, n) তৈরি হয়। ভ্রূণথলি এবং এতে অবস্থিত ডিম্বাণু, সহকারি কোষ, গৌণ নিউক্লিয়াস ও প্রতিপাদ কোষসমষ্টিকে একত্রে বলা হয় **স্ত্রীগ্যামেটোফাইট**। স্ত্রীগ্যামেটোফাইটে **ডিম্বাণু** তথা **স্ত্রীগ্যামেট** তৈরি হয়। অন্যদিকে, শুক্রাণু ও পরাগনালিকাসহ পরাগরেণুকে বলা হয় **পুংগ্যামেটোফাইট**। পুংগ্যামেটোফাইটে জনন নিউক্লিয়াস থেকে **শুক্রাণু** তথা **পুংগ্যামেট** তৈরি হয়।

স্পোরোফাইটিক পর্যায় (2n) : ডিপ্লয়েড জাইগোট (2n) হলো স্পোরোফাইটিক পর্যায়ের প্রথম কোষ। নিষেক প্রক্রিয়ায় হ্যাপ্লয়েড (n) স্ত্রীগ্যামেট ও পুংগ্যামেট মিলিত হয়ে জাইগোট গঠন করে। ডিপ্লয়েড জাইগোট বারবার

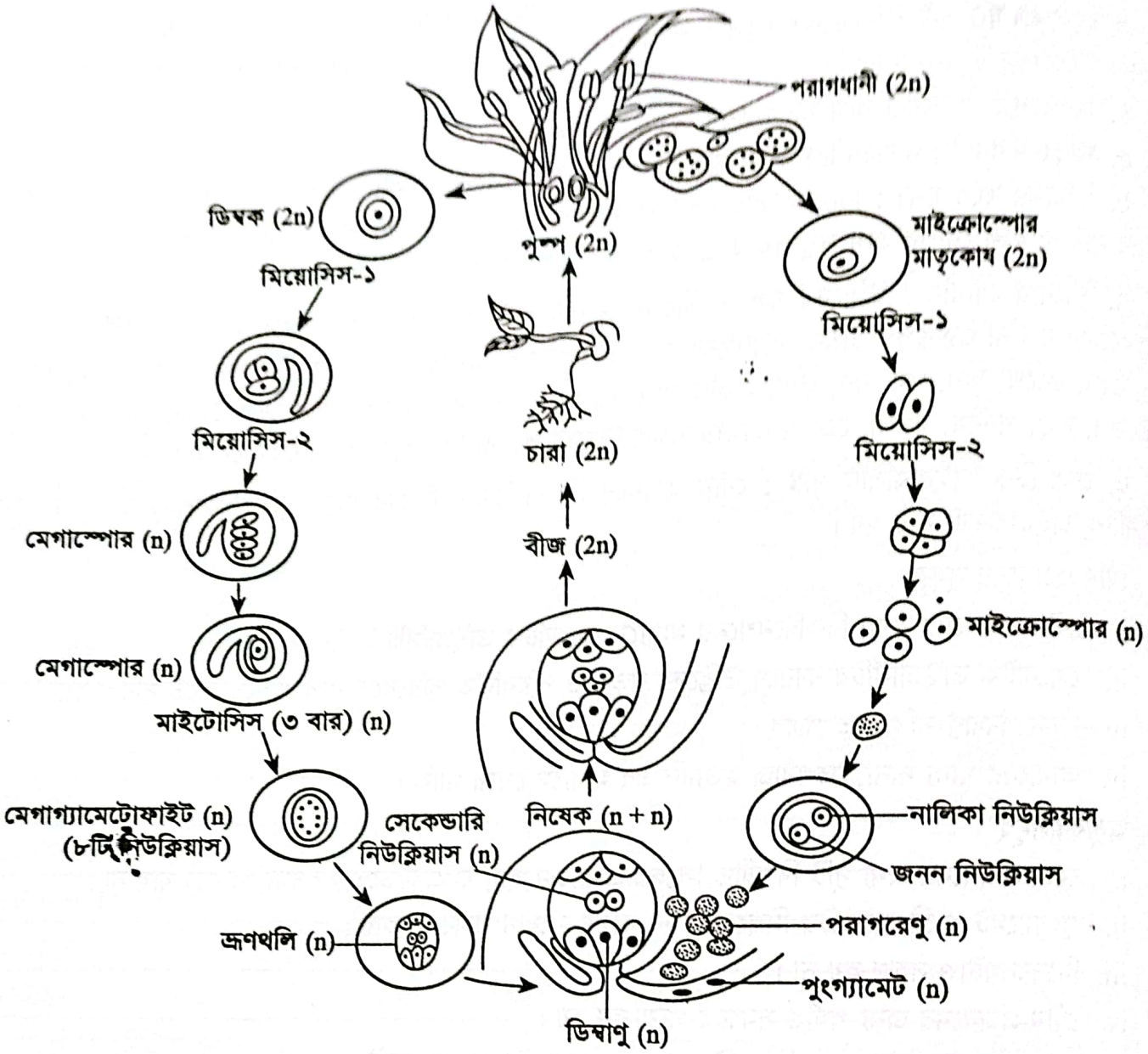

চিত্র ১০.৯ : আবৃতবীজী উদ্ভিদের জীবন চক্রে জনুক্রম।

মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে বহুকোষী ভ্রূণে পরিণত হয় এবং ভ্রূণটি বীজের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। অনুকূল পরিবেশে বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং অবিরত মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে ভ্রূণ শিশু চারায় রূপ নেয়। চারা উদ্ভিদ ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ ডিপ্লয়েড উদ্ভিদের জন্ম দেয়। পরিণত অবস্থায় ডিপ্লয়েড উদ্ভিদে জননাঙ্গ তথা **ফুল** তৈরি হয় এবং সেখানে পুনরায় গ্যামেটোফাইটিক পর্যায়ের পুনরাবৃত্তি ঘটে। এভাবে আবৃতবীজী উদ্ভিদের জীবনচক্রে সুস্পষ্ট জনুক্রম দেখতে পাওয়া যায়।

অযৌন প্রজনন (Asexual Reproduction)

পুং ও স্ত্রী গ্যামেটের মিলন (নিষেক) ছাড়াই যে বংশবিস্তার ঘটে থাকে **অযৌন প্রজনন** বলে। এক্ষেত্রে স্পোর ও অঙ্গ অর্থাৎ মূল, কাণ্ড, পাতা ইত্যাদির মাধ্যমে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়।

অযৌন প্রজননের বৈশিষ্ট্য

i. অযৌন প্রজননের মাধ্যমে একটি মাত্র জীবই বংশবিস্তার করতে পারে।
ii. জীবদেহের কোনো অংশ প্রত্যক্ষভাবে বা **রেণু** উৎপাদনের মাধ্যমে অযৌন প্রজনন সম্পন্ন করে।
iii. অযৌন প্রজনন প্রক্রিয়া মাইটোসিসের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ মিয়োসিসের প্রয়োজন নেই।

iv. এ প্রক্রিয়ায় গ্যামেট উৎপাদন বা নিষেক পদ্ধতি অনুপস্থিত।
v. অযৌন প্রজননে হ্যাপ্লয়েড (n) ও ডিপ্লয়েড (2n) দশার পর্যায়ক্রমিক আবর্তন ঘটে না।
vi. অপত্য জীবগুলো মাতৃজীবের সমবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয় যাদের **ক্লোন** বলে।
vii. মিয়োসিস বা ক্রসিংওভার অনুপস্থিত বলে নতুন বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয় না।
viii. যৌন প্রজননের তুলনায় এটি সহজ ও সরল পদ্ধতি।
ix. অল্প সময়ে দ্রুত হারে বংশবৃদ্ধি ঘটে।
x. সাধারণত অনুকূল পরিবেশে অযৌন প্রজনন সম্পন্ন হয়।

বিভিন্ন ধরনের অযৌন প্রজনন

১. অযৌন স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে

অপুষ্পক উদ্ভিদ সাধারণত বিশেষ ধরনের **রেণু** বা **স্পোর** উৎপাদনের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। বিশেষ আকৃতির থলিতে স্পোর উৎপন্ন হয়। এ থলিকে **রেণুথলি** বা **স্পোরাঞ্জিয়াম** (sporangium) বলে। স্পোর সাধাণত এককোষী তবে বহুকোষীও হতে পারে। এরা সচল অথবা নিশ্চল প্রকৃতির হয়। অনুকূল পরিবেশে স্পোর সরাসরি অঙ্কুরিত হয়ে নতুন বংশধর উৎপন্ন করে। শৈবাল, ছত্রাক, ব্রায়োফাইট ও টেরিডোফাইটে স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যাপক হারে অযৌন জনন ঘটে।

পরিবেশের তারতম্যে অধিকাংশ ছত্রাক ও শৈবাল বিভিন্ন প্রকার স্পোর গঠন করে। এদের মধ্যে পেনিসিলিয়ামের **কনিডিয়া** (conidia) বা **কনিডিওস্পোর** (conidiospore), মিউকরের **স্পোরাঞ্জিওস্পোর** (sporangiospore) বা **গনিডিয়া** (gonidia), অ্যাগারিকাসের **বেসিডিওস্পোর** (basidiospore) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শৈবালের মধ্যে ক্ল্যামাইডোমোনাস **চলরেণু** বা **জুস্পোর** (zoospore) এবং **স্থিররেণু** (resting spore) বা **অ্যাকাইনেটি** (akinete) এবং অন্যান্য বহু শৈবালের স্থূল **প্রাচীরাবদ্ধ অ্যাপ্লানোস্পোর** (aplanospore) ইত্যাদি হলো বিভিন্ন ধরনের অযৌন স্পোর। এছাড়া ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটাভুক্ত উদ্ভিদের রেণুথলিতে উৎপন্ন রেণুগুলো অযৌন প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তারে সহায়ক। ফার্ন (fern) ও লাইকোপোডিয়াম (*Lycopodium*)-এর স্পোর সম-আকৃতির অর্থাৎ **হোমোস্পোরাস** (homoporous), কিন্তু সেলাজিনেলা (*Selaginella*), শুষনি শাক (*Marsilea*) ইত্যাদির স্পোর অসম-আকৃতির অর্থাৎ **হেটারোস্পোরাস** (heterosporous)।

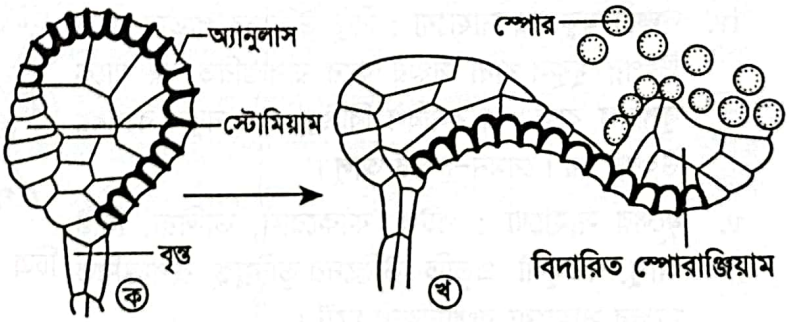

চিত্র ১০.১০ : স্পোরের সাহায্যে অযৌন জনন (ফার্নের স্পোরাঞ্জিয়া)

২. দেহ অঙ্গের মাধ্যমে

আবৃতবীজী উদ্ভিদের কোন দেহ অঙ্গের (যেমন–মূল, কাণ্ড, পাতা) মাধ্যমেও অযৌন জনন সম্পাদিত হয়। দেহ থেকে বিছিন্ন অংশবিশেষ নতুন জীব সৃষ্টি করে বলে একে **অঙ্গজ জনন** বলে। প্রকৃতিতে অনেক উদ্ভিদে স্বাভাবিকভাবেই অঙ্গজ জনন ঘটতে দেখা যায়। তবে কৃত্রিম উপায়েও অঙ্গজ জনন ঘটানো সম্ভব। নিচে বিভিন্ন ধরনের অঙ্গজ প্রজনন আলোচিত হলো।

ক. স্বাভাবিক অঙ্গজ জনন : নিম্নলিখিত উপায়ে স্বাভাবিক অঙ্গজ জনন ঘটতে পারে।

i. **খন্ডায়ন** (Fragmentation) : *Spirogyra, Oscillatoria* প্রভৃতি নিম্নশ্রেণির কিছু উদ্ভিদের (শৈবাল, ছত্রাক ও ব্রায়োফাইট) দেহ কোন কারণে এক বা একাধিক খণ্ডে বিভক্ত হলে প্রায় প্রতিটি খণ্ড থেকে নতুন উদ্ভিদ জন্মায়।

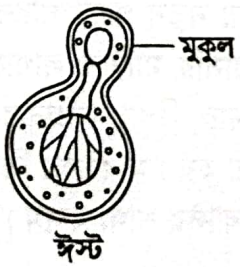

চিত্র ১০.১১ : মুকুলোদগম

ii. **মুকুলোদ্গম** (Budding) : ঈস্ট নিজ দেহে একাধিক মুকুল উৎপাদন করে। প্রতিটি মুকুল বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন ঈস্টের জন্ম দেয়।

iii. **কাণ্ডের মাধ্যমে** : কাণ্ড অনেক সময় স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজননে অংশগ্রহণ করে। নিচে কাণ্ডের মাধ্যমে অঙ্গজ প্রজননের কতিপয় পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

পরিবর্তিত কাণ্ড-কচু

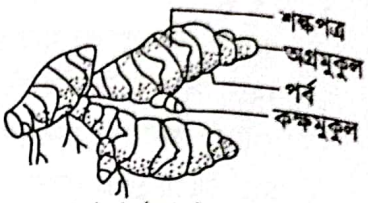

আদা (কাণ্ড)

❑ **স্বাভাবিক কাণ্ড** : পান, আখ প্রভৃতি উদ্ভিদের কাণ্ডের পর্বে মুকুল থেকে নতুন উদ্ভিদ তৈরি হয় বলে এদের কাণ্ড খণ্ডিত করে রোপন করা হয়।

❑ **অর্ধবায়বীয় কাণ্ড** : রানার, স্টোলন, অফসেট, সাকার জাতীয় অর্ধবায়বীয় কাণ্ডের সাহায্যে কিছু গাছ বংশবিস্তার করে। যেমন-কচু, থানকুনি, স্ট্রবেরি, কচুরিপানা, টোপাপানা, চন্দ্রমল্লিকা।

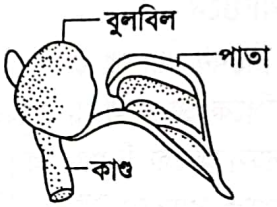

চুপরি আলু

মিষ্টি আলু

শতমূলী

❑ **ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ডের সাহায্যে** : আদা, হলুদ, পেঁয়াজ, আলু প্রভৃতি উদ্ভিদ রূপান্তরিত ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ডের সাহায্যে নতুন বংশধর উৎপন্ন করে।

iv. **সঞ্চয়ী মুকুলের সাহায্যে** : কিছু উদ্ভিদের পাতার কক্ষে উৎপন্ন মুকুল খাদ্য সঞ্চয় করে রূপান্তরিত হয় যাকে **বুলবিল** বলে। এ বুলবিল বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন বংশধর উৎপন্ন হয়। যেমন–চুপরি আলু।

পাথরকুঁচি

ফনিমনসার পর্ণকাণ্ড

চিত্র ১০.১১: কয়েকটি উদ্ভিদের স্বাভাবিক অঙ্গজ জনন

v. **মূলের সাহায্যে** : পটল, কাকরোল, ডালিয়া, মিষ্টি আলু, শতমূলী প্রভৃতি উদ্ভিদের ভূনিম্নস্থ রূপান্তরিত মূলের সাহায্যে বংশবিস্তার ঘটে।

vi. **পাতার সাহায্যে** : পাথরকুঁচি পাতার ফত্রফলকের কিনারায় অস্থানিক মুকুল উৎপন্ন হয়। এ পাতা মাটিতে পতিত হলে চারা গাছ জন্মে। এছাড়া নাইট কুইনেও পাতার মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি ঘটে।

vii. **পর্ণকাণ্ড দ্বারা** : ফণিমনসার পর্ণকাণ্ড থেকে নতুন গাছ হয়।

খ. কৃত্রিম অঙ্গজ জনন : কৃত্রিম পদ্ধতি প্রয়োগ করে ফল ও ফুলের গুণমান বজায় রেখে এ ধরনের জনন ঘটানো হয়। যে পদ্ধতিতে এটি সম্ভব তাকে **কলম** করা বলে। কলম নিম্নবর্ণিত ধরনের হয়ে থাকে।

i. **শাখাকলম বা কাটিং** (Cuttings) : এ প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত গাছের কাণ্ড, কাণ্ডের শাখা, পাতা ও মূলের অংশ কেটে বংশ বৃদ্ধি করা হয়। নির্বাচিত গাছের অংশকে প্রথমে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করে নিতে হয়। পরে খণ্ডকে মাটি, পানি অথবা বালির উপযুক্ত মাধ্যমে রেখে মূলোৎপাদন করে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে লাগাতে হয়। এর ফলে দ্রুত খণ্ডগুলো পল্লবিত হয়ে নতুন গাছে পরিণত হয়। কার্টিং এর জন্য বর্ষাকাল উত্তম সময় হিসেবে বিবেচ্য। বড় ডাল কেটে আর্দ্র পরিবেশে সরাসরি মাটিতে লাগানো যেতে পারে। তবে, এসব ক্ষেত্রে কর্তিত ডাল বাঁচিয়ে তোলা খুবই কঠিন। আখ, গোলাপ, মাদার, জিগা, সজিনার ডাল এভাবেই লাগানো হয়ে থাকে। কাণ্ড ও শাখা হতে এসব কাটিং করা হয় বলে একে **শাখাকলম** বলা হয়। মাধ্যমের ভিত্তিতে শাখা কলমকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা–**মাটির শাখা কলম, পানির শাখা কলম ও বালির শাখা কলম।**

ii. দাবাকলম (Layering) : লেবু, যুঁই প্রভৃতি গাছের মাটি সংলগ্ন লম্বা শাখাকে বাঁকিয়ে মাটি চাপা দিলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মাটির মধ্যে অবস্থিত শাখাটির পর্ব থেকে **অস্থানিক মূল** নির্গত হয়। মাটি চাপা অংশের ছাল কেটে দিলে সেখানে দ্রুত মূল গঠিত হয়। মূলসহ শাখাটি কেটে অন্যত্র লাগালে নতুন গাছের জন্ম হয়। উদাহরণ– চন্দ্রমল্লিকা, আপেল, সফেদা।

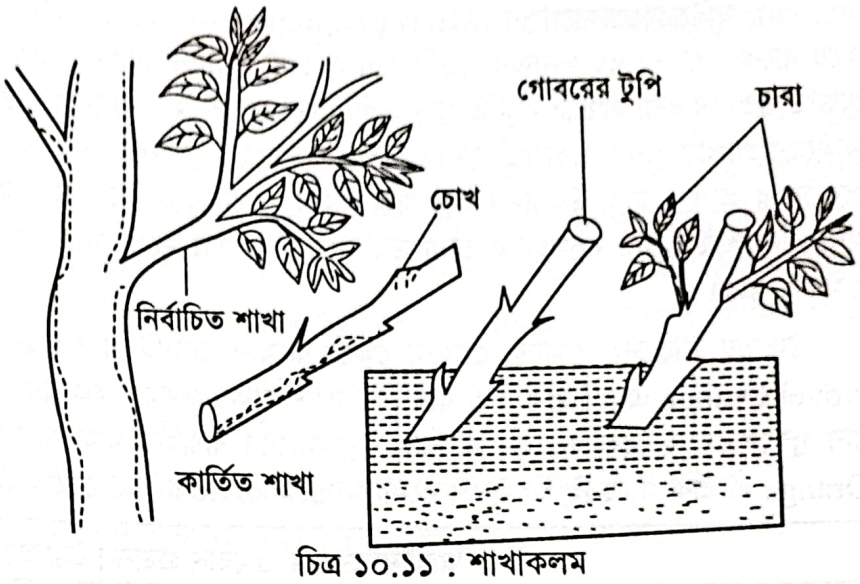

চিত্র ১০.১১ : শাখাকলম

iii. গুটিকলম (Gootee) : শক্ত কাণ্ডযুক্ত যে কোন ফল গাছ, যেমন আম, লেবু, ইত্যাদি বা গন্ধরাজ, গোলাপ ইত্যাদি ফুলের গাছে গুটিকলম তৈরি করা যায়। গুটিকলমের জন্য নির্বাচিত অংশের ছাল ছাড়িয়ে সেখানে গোবর-মাটি ও খড় দিয়ে ঢেকে শক্ত করে দড়ি বেঁধে দিতে হয়। নিয়মিত পানি দিতে থাকলে ঐ অংশে অস্থানিক মূল গঠিত হয়। মূলসহ শাখাটি বিচ্ছিন্ন করে ভিজে মাটিতে রোপণ করলে অন্যত্র তা থেকে নতুন গাছ জন্মায়। যেমন– লেবু, কমলালেবু, বাগান বিলাস।

iv. জোড়কলম (Grafting) : বিভিন্ন ফল ও ফুলগাছের উন্নত মান অপত্য বংশধরের মধ্যে বজায় রাখার জন্য জোড়কলম তৈরি করা হয়। কাংখিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নির্বাচিত গাছের কোন শাখা বাঁকিয়ে অথবা মুকুলসহ একটি শাখাকে বিচ্ছিন্ন করে মাটিতে বা টবে লাগানো অন্য একটি গাছের সঙ্গে জুড়ে দিতে হয়। বিচ্ছিন্ন অংশটিকে **সিয়ন** (scion) এবং সিয়নকে যে গাছের সঙ্গে জোড়া হয় তাকে **স্টক** (stock) বলে। স্টক যেকোন নিম্নমানের গাছ হতে পারে। সিয়নকে লালন করাই স্টকের কাজ। লক্ষণীয় সিয়ন সাধারণত উচ্চমানের গাছের অংশ হয়ে থাকে। সুতরাং ফল বা ফুলের চরিত্র নির্ভর করে সিয়নের উপরে–স্টকের উপরে নয়। উদাহরণ–আম, জাম, লিচু, পেয়ারা, কুল, চাঁপা, ম্যাগনোলিয়া ইত্যাদি।

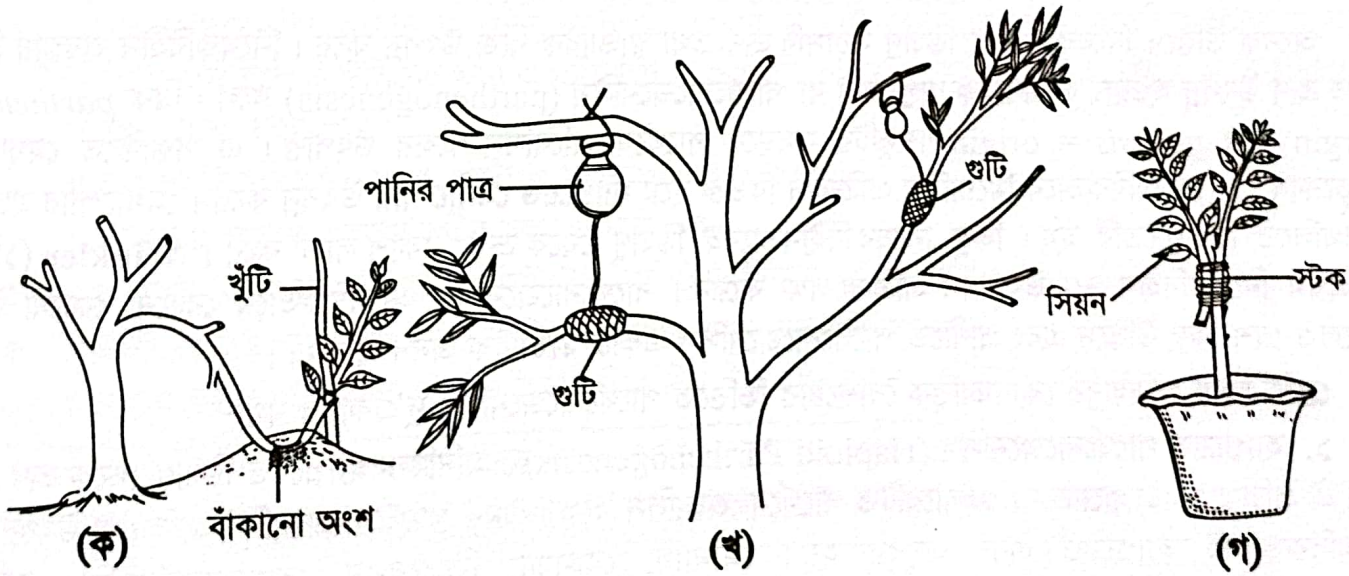

চিত্র ১০.১২ : কলম করার বিভিন্ন পদ্ধতি; ক–দাবাকলম; খ–গুটিকলম; গ জোড়কলম

v. চোখ কলম (Budding) বা **কুঁড়ি সংযোজন** : কাংখিত ফলনযুক্ত গাছের চোখ বা কুঁড়িকে একই প্রজাতির অন্য একটি উদ্ভিদের সমব্যাসযুক্ত ডালের কোন স্থান ছেঁচে খাঁজ অনুযায়ী স্থাপন করলে কিছুদিন পর কাংখিত অংশ হতে মুকুল গজিয়ে ঐ ডাল কাংখিত গুণসম্পন্ন ফল দেবে। বড়ইগাছে সচরাচর এ ধরনের চোখ কলম করা হয়।

vi. মাইক্রোপ্রোপাগেশন (Micropropagation): অযৌন জননের মাধ্যমেই কাঙ্খিত প্রকরণের বংশবৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। এজন্য বহু সনাতন পদ্ধতি পূর্ব থেকেই প্রচলিত আছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এ লক্ষে **মাইক্রোপ্রোপাগেশন** পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। অতি ক্ষুদ্র একটু টিস্যু থেকে অসংখ্য চারা সৃষ্টি করা যায় বলেই এ পদ্ধতির নাম দেয়া হয়েছে মাইক্রোপ্রোপাগেশন। প্রচলিত সনাতন পদ্ধতিসমূহের তুলনায় এ পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ে যেকোনো কাঙ্ক্ষিত নতুন প্রকরণের অসংখ্য চারা উৎপাদন করে স্বল্প সময়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করে নেয়া যায়। এ প্রক্রিয়ায় ভাইরাসমুক্ত চারা তৈরি করা যায়। বিরল উদ্ভিদের বহুসংখ্যক চারা উৎপাদন করে স্বল্প মূল্যে সরবরাহ করা যায় (এবং বন্য আবাস থেকে আহরণ কমানো যায়)।

উচ্চতর উদ্ভিদেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অযৌন জননই বংশবৃদ্ধির একমাত্র উপায় হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ Novel Orange এর উল্লেখ করা যায়। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ব্রাজিলে কমলার বীজ থেকে এমন একটি চারা হয় যার পুষ্পপত্রসমূহ বিকশিত হয় না কিন্তু উন্নতমানের বীজহীন কমলার ফলন হয়। বর্তমানে উৎপাদিত সকল Novel Orange ঐ এক গাছেরই অযৌন জননের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত গাছ থেকে আসছে।

অযৌন প্রজনন ও যৌন প্রজনন এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	অযৌন প্রজনন	যৌন প্রজনন
১. গ্যামেট	গ্যামেট সৃষ্টি হয় না এবং গ্যামেটের প্রয়োজন হয় না।	গ্যামেট সৃষ্টি হয় এবং দুটি বিপরীতধর্মী গ্যামেটের মিলন ঘটে।
২. কোষবিভাজন	মিয়োসিস কোষ বিভাজনের প্রয়োজন হয় না।	মিয়োসিস কোষ বিভাজনের প্রয়োজন হয়।
৩. বৈচিত্র্যতা	সৃষ্ট নতুন উদ্ভিদে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় না।	সৃষ্ট নতুন উদ্ভিদে বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়।
৪. অভিযোজন	সৃষ্ট উদ্ভিদ কম অভিযোজনক্ষম হয়।	সৃষ্ট উদ্ভিদ অধিক অভিযোজনক্ষম হয়।
৫. কোথায় ঘটে	সাধারণত নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে ঘটে।	নিম্ন ও উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে ঘটে।
৬. নিষেক	নিষেক ঘটে না।	নিষেক ঘটে।

পার্থেনোজেনেসিস (Parthenogenesis)

অনেক উদ্ভিদে নিষেক ছাড়াই ডিম্বাণু সরাসরি ভ্রূণ তথা স্বাভাবিক বীজ উৎপন্ন করে। **নিষেকবিহীন অবস্থায় ডিম্বাণু হতে ভ্রূণ উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে অপুংজনি** বা **পার্থেনোজেনেসিস** (parthenogenesis) বলে। গ্রিক *parthenos* = virgin এবং *genesis* = origin শব্দদুটির সমন্বয়ে পার্থেনোজেনিসিস শব্দের উৎপত্তি। এ পদ্ধতিতে **মেগাস্পোর মাতৃকোষ** (2n)স্বাভাবিকভাবে মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে **হ্যাপ্লয়েড মেগাস্পোর** উৎপন্ন করে। মেগাস্পোর হতে সৃষ্ট ভ্রূণথলিতে ডিম্বাণু তৈরি হয়। কিন্তু নিষেকবিহীনভাবেই ডিম্বাণু থেকে ভ্রূণ বিকাশ লাভ করে। **Winkler** (১৯০৮) সর্বপ্রথম নিষেকবিহীন ভ্রূণ উৎপাদন প্রক্রিয়া লক্ষ করেন। পার্থেনোজেনেসিস আকস্মিকভাবে কোনো কোনো উদ্ভিদে ঘটলেও বেশ কিছু উদ্ভিদে এবং প্রাণীতে পার্থেনোজেনেসিস একটি স্বাভাবিক জনন প্রক্রিয়া।

শ্রেণিবিভাগ : ডিম্বাণুর কোষতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পার্থেনোজেনেসিস দু'প্রকার। যথা–

১. হ্যাপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস (Haploid Parthenogenesis) : অনিষিক্ত হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণু থেকে ভ্রূণ উৎপন্ন হলে ঐ প্রক্রিয়াকে **হ্যাপ্লয়েড** বা **জেনারেটিভ পার্থেনোজেনেসিস** বলে। এমন পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন উদ্ভিদ স্বাভাবিকভাবেই হ্যাপ্লয়েড এবং অনুর্বর হয়। মৌমাছি, বোলতা, তিতবেগুন, তামাকে নিয়মিত হ্যাপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস ঘটতে দেখা যায়।

২. ডিপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস (Diploid Parthenogenesis) : যখন স্বাভাবিক মিয়োসিস প্রক্রিয়ার বদলে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু (2n) সৃষ্টি হয় এবং পরে ভ্রূণে পরিণত হয় তাকে **ডিপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস** বলে। *Parthenium argentatum* ও *Taraxacum albidum* উদ্ভিদে ডিপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস হতে দেখা যায়।

Nicotiana tabacum (তামাক) এ অনিষিক্ত শুক্রাণু হতে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। নিষেকক্রিয়া ছাড়া শুক্রাণু থেকে ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে **অ্যান্ড্রোজেনেসিস** (androgenesis) বলে।

কৃত্রিম পার্থেনোজেনেসিস : কৃত্রিমভাবে অনেক উদ্ভিদে পার্থেনোজেনেসিস ঘটানো সম্ভব হয়েছে। পুংগ্যামেট ডিম্বাণুতে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এরূপ উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী পদার্থ প্রয়োগ করে নিষেকবিহীনভাবেই ডিম্বাণু থেকে ভ্রূণ তৈরি করা হয়। এঙ্গ-রে প্রয়োগে, অন্য উদ্ভিদের পরাগ দিয়ে পরাগায়ন করে, ইমাস্কুলেশন, পর-পরাগায়ন বিলম্বিত করে বা বেনজিটান নামক রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে কৃত্রিমভাবে পার্থেনোজেনেসিস ঘটানো সম্ভব হয়েছে। এভাবে কৃত্রিম পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে বীজহীন ফল উৎপাদন প্রক্রিয়াকে **পার্থেনোকার্পি** (parthenocarpy) বলে। যেমন- লেবু, কমলালেবু প্রভৃতি।

জীবে সাধারণত দু'ভাবে কৃত্রিম পার্থেনোজেনেসিস ঘটানো হয়ে থাকে। যথা–

ক. ভৌত পদ্ধতি : নিম্নলিখিত উপায়গুলো অনুসরণের মাধ্যমে কৃত্রিম পার্থেনোজেনেসিস ঘটানো যায়–

i. অনিষিক্ত ডিম্বাণুকে বৈদ্যুতিক শকের মাধ্যমে পার্থেনোজেনেসিস ঘটানো যায়।

ii অনেক সময় অনিষিক্ত ডিম্বাণুকে 30°C তাপমাত্রা থেকে 0°C-10°C তাপমাত্রায় স্থানান্তরের মাধ্যমে পার্থেনোজেনেসিস ঘটানো যায়। অর্থাৎ অনিষিক্ত ডিম্বাণুতে তাপমাত্রার বিস্তর পরিবর্তন ঘটিয়ে পার্থেনোজেনেসিস ঘটানো যায়।

iii. সূক্ষ্ম সুঁচের সাহায্যে ডিম্বাণুকে খোচালে অনেক সময় পার্থেনোজেনেসিস ঘটে।

iv. অতিবেগুনি রশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে পার্থেনোজেনেসিস ঘটানো যায়।

খ. রাসায়নিক পদ্ধতি : জীববিজ্ঞানীদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে কিছু রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে অনিষিক্ত ডিম্বাণু পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় ভ্রূণ সৃষ্টি করে। পার্থেনোজেনেসিস সংঘটনকারী কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ হলো–পটাসিয়াম ক্লোরাইড, ক্লোরোফর্ম, সোডিয়াম ক্লোরাইড, বিউটারিক এসিড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, টলুইন, বেনজিন, অ্যাসিটোন ইত্যাদি।

পার্থেনোজেনেসিস-এর গুরুত্ব

১. কোনো উদ্ভিদে যদি অযৌন বা যৌন পদ্ধতিতে প্রজনন না ঘটে কেবল পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় নতুন উদ্ভিদের জন্ম হলে ঐ উদ্ভিদের জন্য এ প্রক্রিয়াটি অতি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বন্ধ্যাত্বের হাত থেকে বা বিলুপ্তির হাত থেকে প্রজাতি রক্ষা পায়।
২. এ প্রক্রিয়া জীবের অতি সরল, স্থায়ী ও সহজ প্রজনন প্রক্রিয়া।
৩. এ প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকরণ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না।
৪. এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের সুবিধাজনক মিউটেন্ট বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটতে পারে।
৫. এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ ব্রিডিং গবেষণায় কাজে লাগানো যায়।
৬. অনেক জীবে পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় লিঙ্গ নির্ধারিত হয়, যেমন– মৌমাছি, বোলতা।

পার্থেনোজেনেসিস ও যৌন প্রজনন এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	পার্থেনোজেনেসিস	যৌন প্রজনন
১. গ্যামেট	পুংগ্যামেটের প্রয়োজন হয় না।	পুং ও স্ত্রী উভয় গ্যামেটের প্রয়োজন হয়।
২. নিষেক	নিষেকের প্রয়োজন হয় না।	নিষেকের প্রয়োজন হয়।
৩. অপত্য সৃষ্টি	অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে সরাসরি পূর্ণাঙ্গ অপত্য জীব সৃষ্টি হয়।	নিষেকের ফলে ডিপ্লয়েড জাইগোট থেকে পরিণত অপত্য জীব সৃষ্টি হয়।
৪. চারিত্রিক গুণাবলি	অপত্যের মধ্যে কেবল মাতার চারিত্রিক গুণাবলি পরিলক্ষিত হয়।	অপত্যের মধ্যে মাতা-পিতার চারিত্রিক গুণাবলি পরিলক্ষিত হয়।

❑ **অ্যাপোস্পোরি** (Apospory) : উদ্ভিদের যেকোনো ডিপ্লয়েড অঙ্গজ কোষ (2n) হতে যখন সরাসরি গ্যামেটোফাইটের উৎপত্তি ঘটে, তখন সেই অস্বাভাবিক অঙ্গজ জনন পদ্ধতিকে **অ্যাপোস্পোরি** বলে। এক্ষেত্রে ডিপ্লয়েড ডিম্বাণু ভ্রূণ সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মক্ষম বীজ তৈরি করে। এখানে প্রাপ্ত উদ্ভিদ ডিপ্লয়েড এবং মাতৃ উদ্ভিদের সমগুণ সম্পন্ন হয়। যেমন– *Hieracium* সহ বিভিন্ন প্রকার ফার্ন।

❑ **অ্যাপোগ্যামি** (Apogamy) : ডিম্বাণু ছাড়া ভ্রূণথলির অন্য যেকোনো কোষ থেকে ভ্রূণ (n) সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে **অ্যাপোগ্যামি** বলে। যেমন-*Allium* সহ বিভিন্ন প্রকার ফার্নে দেখা যায়।

❑ **অ্যাডভেনটিটিভ এমব্রায়োনি** (Adventitive embryony) : ডিম্বকের যে কোনো কোষ হতে ভ্রূণথলি গঠন ছাড়াই ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে **অ্যাডভেনটিটিভ এমব্রায়োনি** বলে।

❑ **অ্যাগ্যামোস্পার্মি** (Agamospermy) : নিষেক ছাড়া ডিম্বাণু, ভ্রূণথলি বা ডিম্বকের অন্যান্য কোষ থেকে ভ্রূণ তৈরির প্রক্রিয়াকে সামগ্রিকভাবে **অ্যাগ্যামোস্পার্মি** বলে।

উদ্ভিদের কৃত্রিম প্রজনন (Artificial Reproduction of Plants)

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মানুষ যখন চাষাবাদ শুরু করে তখন তাকে তার প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ নির্বাচনের (selection) মাধ্যমে সেগুলোকে রোপণ করতে শিখেছে। এসব নির্বাচিত উদ্ভিদ আরও উন্নত করতে মানুষ নানা ধরনের কৌশল উদ্ভাবন করেছে। বিজ্ঞানী Camerarius (১৬০৪) প্রথমে কিছু উদ্ভিদের মধ্যে পরাগায়ন নিয়ন্ত্রণ কৌশল উদ্ভাবন করেন। এর মাধ্যমে তিনি কয়েকটি উদ্ভিদের পুষ্পের স্ত্রী ও পুং অংশ চিহ্নিত করে প্রজনন কৌশল আবিষ্কার করেন। এ কৌশল কাজে লাগিয়ে Koelreuter (১৭৬১) বেশ কিছু উদ্ভিদের *(Dianthus, Nicotiana, Hyoscymus)* সংকর উদ্ভিদ উৎপাদন করে চমক সৃষ্টি করেন। এরপর মেন্ডেলীয় ধারণা প্রতিষ্ঠিত হলে এর ধারার অগ্রগতি আরও ত্বরান্বিত হয়। দুটি বিসদৃশ্য নির্বাচিত উদ্ভিদের মধ্যে যেখানে প্রাকৃতিক উপায়ে পরাগায়ন ও প্রজনন ঘটানো সম্ভব সেখানে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে পরাগায়ন ঘটিয়ে উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন সাধন করে উন্নত প্রকরণ বা জাত সৃষ্টি করাকে উদ্ভিদের কৃত্রিম প্রজনন বলে। এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট উদ্ভিদকে **সংকর** (hybrid) বলা হয়। এর মাধ্যমে উদ্ভিদের উপস্থিত বৈশিষ্ট্যগুলো এক উদ্ভিদ থেকে আরেক উদ্ভিদে যেমন স্থানান্তর করা যায় তেমনি তার বৈশিষ্ট্যগুলোর মানও উন্নত করা যায়।

কৃত্রিম প্রজনন প্রক্রিয়া

কৃত্রিম উপায়ে সাধারণত উন্নত বৈশিষ্ট্যমন্ডিত নতুন প্রকরণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে **সংকরায়ন** বা **হাইব্রিডাইজেশন** (hybridization) বলে। নিম্নে সংকরায়নের ধাপগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

১. প্যারেন্ট নির্বাচন (Selection of parents) : সংকরায়নের জন্য সঠিক উদ্ভিদ নির্বাচন এই প্রক্রিয়ার প্রথম কাজ। এ কাজে সতেজ ও সবল উদ্ভিদ নির্বাচন বাঞ্ছনীয়।

২. প্যারেন্টের স্ব-পরাগায়ন (Selfing of parents) : এ পর্যায়ে নির্বাচিত প্যারেন্টের মধ্যে স্ব-পরাগায়ন ঘটানো হয়।

৩. ইমাস্কুলেশন (Emasculation) : সংকরায়নের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ প্রক্রিয়ায় পরাগধানী পরিপুষ্ট ও পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই স্ত্রীউদ্ভিদ হিসেবে চিহ্নিত গাছের উভলিঙ্গ ফুল হতে পুংকেশরগুলো অপসারণ করা হয়। এভাবে উভলিঙ্গ ফুলকে পুরুষত্বহীন করার পদ্ধতিকে ইমাস্কুলেশন বলে।

৪. ব্যাগিং (Bagging) : ইমাস্কুলেশনের পর ঐ উদ্ভিদগুলোর ফুলসহ বিটপের অংশ পলিথিন ব্যাগ দিয়ে আবদ্ধ করে রাখা হয়, যাতে পর-পরাগায়ন ও সংক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

৫. ক্রসিং (Crossing) : নির্ধারিত পুরুষ ফুলের পরাগধানী হতে পরাগরেণু সংগ্রহ করে সেগুলোকে ইমাস্কুলেটেড স্ত্রী ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থাপন করা হয়। এ প্রক্রিয়াকে **ক্রসিং** বলে। এ কাজের সময় স্ত্রী ফুলের ব্যাগটি সাময়িকভাবে সরিয়ে ফেলা হয় এবং ক্রসিং-এর পর সেটি পুনরায় স্থাপন করা হয়।

৬. লেবেলিং (Labelling) : ক্রসিং এর পর পরই ঐ ফুলগুলোকে ট্যাগ দিয়ে বেঁধে চিহ্নিত করে রাখা হয়। এতে ইমাস্কুলেশনের তারিখ, ক্রসিং এর তারিখ, উদ্ভিদের বিবরণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে।

৭. বীজ সংগ্রহ (Harvesting of seeds) : ফল পরিপক্ব হলে ব্যাগ খুলে ফল কেটে এনে তা থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়। বীজগুলো শুকিয়ে লেবেলসহ সংরক্ষণ করতে হয়।

৮. বীজ বপন (Broadcasting of seeds) : পরবর্তী মৌসুমে জমিতে বীজ বপন করা হয়।

৯. F_1-বংশধরের উদ্ভব (Raising of F_1 generation) : পরবর্তী জনন ঋতুতে সংরক্ষিত বীজগুলোকে বপন করে যেসব উদ্ভিদ পাওয়া যায় তারা সকলেই সংকর (hybrid)। কারণ তাদের পিতৃ ও মাতৃ উদ্ভিদের জিনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ছিল পৃথক ধরনের। এ বংশের উদ্ভিদগুলোকে F_1-বংশধর বলা হয়।

১০. F_1-বংশধরের ব্যবহার ও নতুন প্রকরণ সৃষ্টি (Handling of F_1-generation and raising of new variety) : F_1 বংশধরের দুটি উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস করিয়ে যেসব উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় সেগুলোর নাম হয় F_2-বংশধর। একই পদ্ধতিতে কয়েক প্রজন্ম (generation) ধরে এভাবে সংকরায়ন করতে করতে একটি নতুন প্রকরণ (variety)-এর জন্ম হয়।

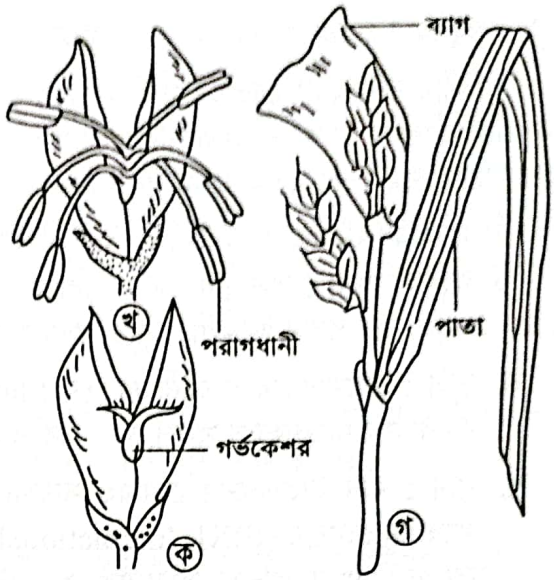

চিত্র ১০.১৩ : ইমাস্কুলেশন

সংকরায়ন পদ্ধতির সতর্কতা (Precaution)

১. প্যারেন্ট নির্বাচন করার সময় তাদের পার্থক্যগুলো সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করতে হয়।

২. ইমাস্কুলেশন ও পরাগায়নের সময় হাত, সূঁচ, চিমটা, তুলি প্রভৃতি স্পিরিট দিয়ে ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হয়।

৩. লক্ষ রাখতে হবে, ইমাস্কুলেশনের সময় যেন একটি পুংকেশরও থেকে না যায় এবং গর্ভকেশরের যেন কোন ক্ষতি না হয়।

৪. ব্যাগিং ঠিকমতো করতে হবে এবং এর মধ্যে বায়ু প্রবেশের জন্য সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকতে হবে।

৫. সংকর বীজ সংগ্রহ এবং এক্ষেত্রে কলা-কৌশল গ্রহণ সঠিকভাবে নিতে হবে।

বিবর্তনে কৃত্রিম প্রজননের ভূমিকা

উদ্ভিদ বিবর্তনে কৃত্রিম প্রজননের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। নিম্নে কৃত্রিম প্রজননের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

ভ্যারিয়েশন সৃষ্টি : বিবর্তনের আধুনিক ধারণা মতে মিউটেশন, ক্রোমোজোমীয় মিউটেশন, জেনেটিক রিকম্বিনেশন, প্রজাতি বৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ফলে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উন্নত গুণসম্পন্ন নতুন নতুন প্রজাতি তৈরি হয় যার মাধ্যমে ভ্যারিয়েশন (বৈচিত্র্যের) সৃষ্টি হয়।

প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাত তৈরি : কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা প্রতিরোধক্ষম জাত তৈরি করা যায়। এ জাত নতুন পরিবেশের সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

রোগ প্রতিরোধী জাত তৈরি : শস্যের সর্বোচ্চ ফলনের প্রধান সমস্যা হলো রোগ ও কীট পতঙ্গের আক্রমণ। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের রোগ প্রতিরোধী জাত তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। BRRI উদ্ভাবিত মুক্তা (বিআর-১০), গাজী (বিআর-১৪), মোহিনী (বিআর-১৫) হচ্ছে রোগ প্রতিরোধী জাত।

গুণগত মান উন্নয়ন : খাদ্য শস্যের ক্ষেত্রে দানার আকার, বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, দীর্ঘ সংরক্ষণ সময় ইত্যাদি উন্নত বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে এসব বৈশিষ্ট্য স্থানান্তর করে উদ্ভিদের গুণগত মান উন্নয়ন করা যায়।

আবাদকাল সংক্ষিপ্তকরণ : বন্যার কারণে অনেক নিম্নভূমির আবাদ নষ্ট হয়ে যায়। আবার ঝড়ের প্রকোপেও অনেক ফসল নষ্ট হয়। কৃত্রিম সংকরায়নের মাধ্যমে ফসলের আবাদকাল ২০-৩০ দিন পর্যন্ত কমানো সম্ভব। এতে বন্যার পূর্বেই ফসল সংগ্রহ করা যাবে।

কৃত্রিম প্রজননের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

পৃথিবীর জনসংখ্যা যেভাবে দ্রুত হারে বাড়ছে সে তুলনায় খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে না। আমাদের মতো অনুন্নত দেশগুলোর খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। উন্নত প্রকরণের উদ্ভিদ লাগিয়ে কম খরচে অধিক ফসল ফলানোই হলো বর্তমান সময়ের কৃত্রিম প্রজননের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

নিম্নে কৃত্রিম প্রজননের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করা হলো।

১. **অধিক ফলন :** শস্যদানা, তন্তু, গবাদি পশুর খাদ্য, ফল প্রভৃতি উদ্ভিদজাত উৎপন্ন দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা কৃত্রিম প্রজনন এর প্রধান উদ্দেশ্য। নিচে শস্যদানার ক্ষেত্রে কয়েকটি সাফল্য উল্লেখ করা হলো।

ক. ভুট্টা : আমেরিকার বিজ্ঞানী G. H. Shull ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ভুট্টার সংকর উদ্ভিদ সৃষ্টির মাধ্যমে ভুট্টার দানা উৎপাদনে দারুণভাবে সফল হন। এর পর ভুট্টার দ্বিসংকর পদ্ধতিতে এর উৎপাদন আরও বাড়ানো হয়েছে।

খ. ধান : ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রেও সাফল্য এসেছে। ১৯৬০-এর দশকে ফিলিপিনে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্রের (IRRI, International Rice Research Institute) বিজ্ঞানীগণ **ইরি** (IRRI) ধান উদ্ভাবন করেন। এখন এশিয়া মহাদেশে ধান উৎপাদন গত ৪০ বছরে প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। IRRI এক উচ্চ ফলনশীল ধানের সংকর জাত যা তাইওয়ানের প্রাকৃতিক খাটো জাত 'Dee-gee-woo-gen' এবং ইন্দোনেশিয়ার লম্বা প্রকৃতির 'Peta' জাতের মধ্যে কৃত্রিম সংকরায়ন ঘটিয়ে উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর মধ্যে IR8 জাতের ধান বহুল পরিচিতি লাভ করেছে। বাংলাদেশেও ধান গবেষণা কেন্দ্র **BRRI** (Bangladesh Rice Research Institute) থেকে একই প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন করেছে **BRRI** (ব্রি) নামক বেশ কয়েক জাতের উচ্চ ফলনশীল ধান যা বাংলাদেশের খাদ্য সংকট থেকে অনেকাংশে রক্ষা করেছে। এর মধ্যে ব্রি-৮, ব্রি-১১, ব্রি-১৫ ও ব্রি-২৯ উল্লেখযোগ্য।

গ. গম : ঠিক একই উপায়ে গমের ক্ষেত্রেও বিপ্লব ঘটেছে। বর্তমানে বিশ্বের যে উন্নত জাতের গমের চাষ হচ্ছে তার প্রায় সব গমই সৃষ্টি হয়েছে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে। স্বনামধন্য আমেরিকান বিজ্ঞানী Norman Earnest Borlaug যে উচ্চ ফলনশীল মেক্সিকান গম উদ্ভাবন করেছেন তাতে পৃথিবীতে গম উৎপাদনের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। পৃথিবীর ক্ষুধার্ত মানুষের কল্যাণে ও অবদানের জন্য তাঁকে ১৯৭০ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

২. **উন্নত গুণগতমান :** গুণগত মানের ওপর ঐ ফসলের ব্যবহার নির্ভর করে। ফসলভেদে গুণগতমানের পার্থক্য হয়ে থাকে। যেমন খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে দানার আকার, বর্ণ, গন্ধ, রন্ধন গুণাগুণ, সংরক্ষণ ইত্যাদি ফলের আকার, বর্ণ, গন্ধ ইত্যাদি সবজির সংরক্ষণমান, ইক্ষুর শর্করার পরিমাণ ইত্যাদি।

৩. **পরিপক্কতা কালের পরিবর্তন :** ভিন্ন ঋতুতে চাষ, অধিকাংশ ফসলের দ্রুত পরিপক্কতা লাভ, কোনো কোনো ফসল বিলম্বে হলে আমরা আর্থিকভাবে বেশি লাভবান হতে পারি। যেমন-গ্রীষ্মকালীন টমাটো, চিচিঙা প্রভৃতি।

৪. **সমকালীন পরিপক্কতা লাভ :** সমকালীন পরিপক্ক ফসলের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক উপায়ে ফসল উত্তোলনে ব্যয় হ্রাস পায়। এমন ধরনের মুগ ডাল উদ্ভাবন হয়েছে।

৫. **কৃষিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন :** উদ্ভিদের খর্বতা (অড়হর, কার্পাস), জলাবদ্ধতা সহনশীলতা (দেশিপাট), শাখাহীনতা (পাট গাছ, কাঠ উৎপাদনকারী বৃক্ষ), বৃহদাকার দেহ (আমগাছ), আলোক সংবেদনশীলতা না থাকা (ধান, গম, ভুট্টা) বৈশিষ্ট্যগুলোতে পরিবর্তন করা সম্ভব হয়েছে।

৬. **রোগ প্রতিরোধী জাত উৎপাদন :** বিভিন্ন রোগ সংক্রমনের ফলে প্রচুর পরিমাণে আবাদি ফসলে ফলনহানী ঘটে। বুনো প্রজাতির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি হওয়ায় সংকরায়নের মাধ্যমে এ বৈশিষ্ট্য আবাদি জাতে কৃত্রিমভাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধী জাত উৎপাদন সম্ভব। গাজী (BR-14), মুক্তা (BR-11), মোহিনী (BR-15), শাহীবালাম (BR-16) প্রভৃতি ধানের রোগ প্রতিরোধী জাত।